ভাবনার গভীরে

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং
আকাশসমূহ ও পৃথিবী সম্বন্ধে অনুধ্যান করে এবং
বলে, হে আমাদের প্রভু! তুমি ইহা অকাজে
সৃষ্টি কর নাই। মহিমা তোমার। দোযখের
আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর।"
(সূরা আল ইমরান ঃ আয়াত-১৯১)

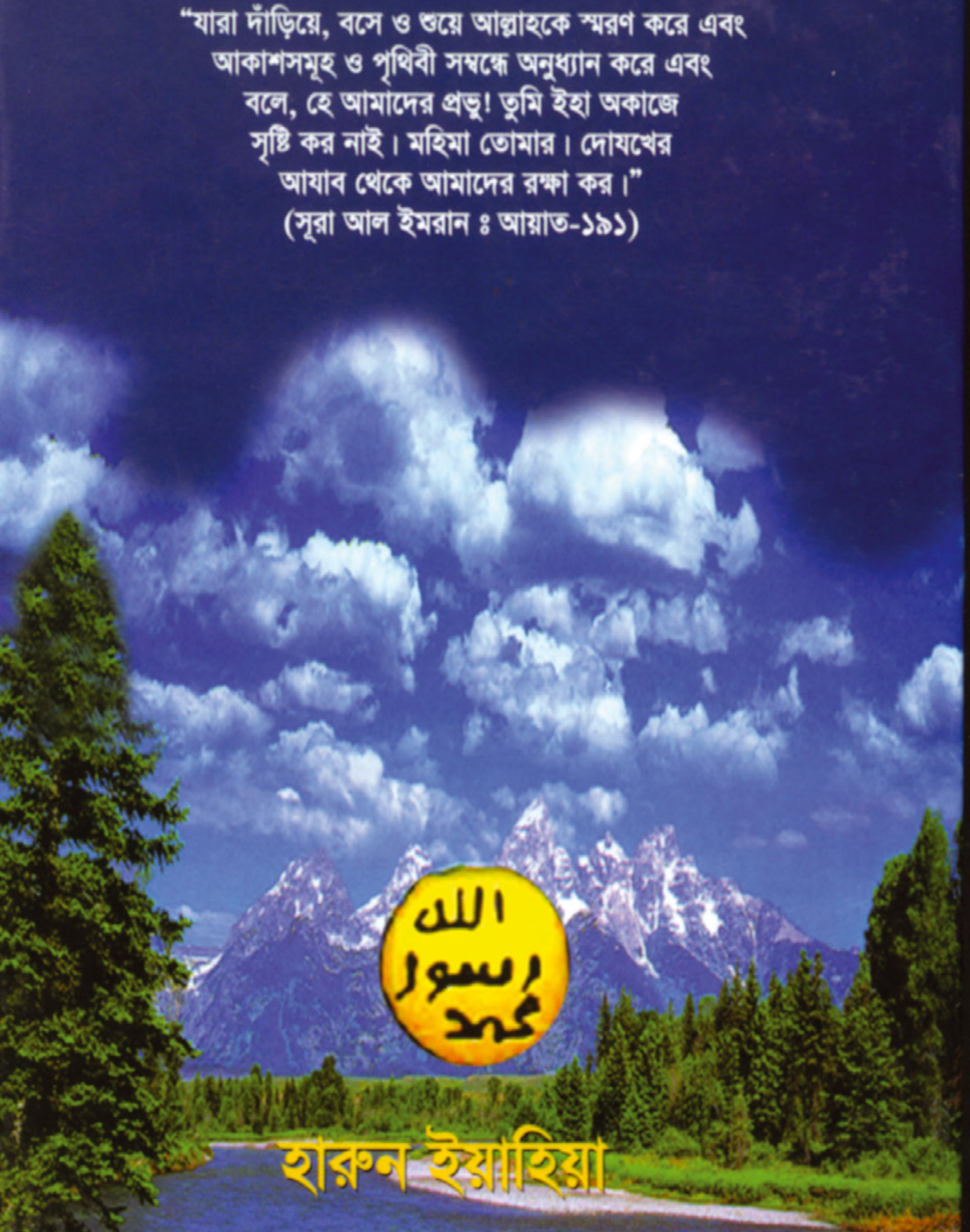

হারুন ইয়াহিয়া

ভাবনার গভীরে

ভাবনার গভীরে

মূল

হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদ

প্রফেসর গোলাম মোরশেদ
ডাঃ উম্মে কাওসার হক

আশরাফিয়া বইঘর
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৬৩৯১

ভাবনার গভীরে
হারুন ইয়াহিয়া

প্রকাশক
ড. কাজী মনজুরুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
ইন্ট্যারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি
মালয়েশিয়া

প্রথম প্রকাশ
মার্চ ২০০৪

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

কম্পিউটার কম্পোজ
আইডিয়াল কম্পিউটার এণ্ড গ্রাফিক্স
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০

মুদ্রণে
হাসান প্রিন্টিং প্রেস
২৪ শিরিসদাস লেন
ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা
US $ 5

পাঠকের প্রতি

গ্রন্থাকারের সকল বইয়ে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়সমূহ কোরআনের আয়াতের আলোকে ব্যক্ত করা হয়েছে এবং মানুষকে কোরআনের বাণীসমূহের শিক্ষা ও তদানুসারে জীবনযাপনের প্রতি দাওয়াত দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার আয়াত সম্পর্কিত সকল বিষয় এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাতে এ বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ বা পাঠকের মনে কোন প্রশ্নের রেখাপাত না করে। আন্তরিক, খোলামেলা, স্বচ্ছন্দ বাচনভঙ্গীর ব্যবহার প্রত্যেক বয়সও সামাজিক গোষ্ঠীর প্রত্যেক ব্যক্তিকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা নিশ্চিত করে। এই কার্যকরী ও সহজবোধ্য পদ্ধতিতে লিখিত বিবরণী একটিবার বসেই (একটানা) পাঠ করে শেষ করা যায়। এমনকি যারা প্রচন্ডভাবে আধ্যাত্মিকতা প্রত্যাখ্যান করে তারা এই বইগুলোতে বর্ণিত শ্বাশ্বত সত্যগুলো দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় এবং এদের (বইগুলোর) আধেয়-এর (আলোচ্যসূচির) সত্যনিষ্ঠতা খণ্ডন করতে পারে না।

লেখকের এই বই ও অন্যান্য সকল রচনাবলি ব্যক্তিগত বা দলীয় আলোচনার সময় পাঠ করা যেতে পারে। একদল পাঠক যারা বইগুলো পঠনের মাধ্যমে কিছু সুফল পেতে ইচ্ছুক তাদের এই ধারণামতে বইগুলো দরকারি যে, পাঠকগণ তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং অভিজ্ঞতা একে অন্যের মধ্যে বিনিময় করতে পারেন।

তদুপরি, এই বইগুলো যা কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্য লিখিত, তাদের উপস্থাপনা ও পঠনে ধর্মের প্রতি অবদান রাখায় এটি একটি মহান সার্ভিস বলে গণ্য হবে। লেখকের সব বইগুলো অতিশয় চূড়ান্তভাবে বিশ্বাসযোগ্য। এ কারণে যারা ধর্মকে অন্যদের নিকট সম্প্রচার করতে চায় তাদের জন্য বইগুলো পড়ে উৎসাহ জোগানো সকল কার্যকরী পদ্ধতিসমূহের মধ্যে এটি একটি।

আশা করা যাচ্ছে, পাঠক বইটির শেষ পৃষ্ঠাসমূহে অন্যান্য বইয়ের পূনঃপর্যালোচনা পড়ে দেখার জন্য সময় করে নেবেন এবং ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় সমূহের উপর প্রচুর উপকরণ যা দরকারী ও পড়তে আনন্দদায়ক তা মূল্যায়ণ করতে পারবেন।

এই বইগুলোতে অন্যান্য বইয়ের মত আপনি দেখতে পাবেন লেখকের ব্যক্তিগত মতামত; সন্দেহজনক উৎসের উপর ব্যাখ্যা, ষ্টাইল (রচনাশৈলী) যা পবিত্র বিষয়সমূহে হওয়ার কারণে সম্মান ও শ্রদ্ধা তাতে অলক্ষিত, আর আশাশূন্য, সন্দেহ সৃষ্টিকারী এবং দুঃখবাদমূলক বিবরণ যা অন্তরে বিচ্যুতি ঘটায়, তা দেখতে পাবেন না।

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থকার যিনি হারুন ইয়াহিয়া ছদ্ম নামে লেখালেখি করেন, তিনি ১৯৫৬ সনে আঙ্কারায় জন্ম গ্রহণ করেন। আঙ্কারায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ইস্তাম্বুল মিমার সিনার বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯৮০ সন থেকে এই লেখক রাজনৈতিক, ধর্ম সম্পর্কিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বহু বই লিখেন। হারুন ইয়াহিয়া একজন লেখক হিসেবে সুপরিচিত, যিনি বিবর্তনবাদবাদীদের ভণ্ডামী, তাদের দাবীর অসারতা এবং ডারউইনবাদ ও অর্থহীন ভাববাদ যেমন ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে অন্ধ যোগাযোগ ফাঁস করে দিয়েছেন।

তার কলম নাম হারুন (Aron) এবং ইয়াহিয়া (John) এই দুই সম্মানিত রসূলের স্মরণে গঠিত—যারা নাস্তিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। লেখকের বইয়ের উপরিপৃষ্ঠে রসূলের মোহর বইটির বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতি রেখে দেয়ায় তা একটি প্রতীকি অর্থ বুঝায়। এই মোহর সর্বশেষ কিতাব কোরআন এবং আল্লাহর সর্বশেষ বাণী এবং আমাদের রসূল যিনি শেষ নবী এদের প্রতিনিধিত্ব করে। কোরআন ও সুন্নাহর দেখানো পথ অনুযায়ী লেখকের প্রধান লক্ষ্য হলো প্রত্যেক স্রষ্টাবিহীন আদর্শের মূল বিশ্বাসের লোককে অগ্রাহ্য করা এবং 'শেষ কথা' যাতে ধর্মের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি স্তব্ধ হয়ে যায়। রসূল যিনি চূড়ান্ত প্রজ্ঞা এবং নৈতিক পূর্ণতা প্রাপ্ত তাঁর মোহর শেষ বাণী বলার ইচ্ছার নিদর্শন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

লেখকের সকল রচনাবলি একটিমাত্র লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত ঃ মানুষের নিকট কোরআনের বার্তা নিয়ে যাওয়া, এরূপে তাদেরকে ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় যেমন আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ব এবং পরকাল সম্পর্কে চিন্তা করতে তাদের অনুপ্রাণিত করা ও ঈশ্বরবিহীন পদ্ধতির জরাজীর্ণ ভিত্তি ও বিকৃত রচনাবলি প্রদর্শন করা।

ভারত থেকে আমেরিকা, বিলাত থেকে ইন্দোনেশিয়া, পোল্যাণ্ড থেকে বসনিয়া এবং স্পেন থেকে ব্রাজিল এরূপ বহু দেশে হারুন ইয়াহিয়ার পাঠক রয়েছে। তার কিছু বই ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইটালি, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, উর্দ্দু, আরবি, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, সার্ব-ক্রোট (বসনিয়ান), পোলিশ মালয় বউগোর টার্কিশ এবং ইন্দোনেশিয়া ভাষায় পাওয়া যায় এবং এগুলোর পাঠক সারা পৃথিবীব্যাপী।

পৃথিবীর সর্বত্র উচ্চমানে মূল্যায়িত, এ সব রচনা অনেক মানুষের মনে ধর্মে বিশ্বাস আনার এবং অনেকের মধ্যে তাদের ধর্মে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি লাভের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে। যে বিজ্ঞতা, খোলামেলা এবং সহজে বুঝার ষ্টাইল ব্যবহার করা হয়েছে তা বইগুলোকে দিয়েছে স্পষ্ট হৃদয়ানুভূতি যা সরাসরি কোন ব্যক্তি যিনি পড়েন বা পরীক্ষা করেন তাকে নাড়া দেয়। প্রতিবাদমুক্ত এ সব রচনাবলি তাদের দ্রুত কার্যকারিতার সুনির্দিষ্ট ফলাফল এবং অখণ্ডনীয়তা দ্বারা বিশিষ্টতা দান করেছে। এটা অসম্ভব যে যারা এই বইগুলো পড়ে এবং এ গুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে তারা আর কখনও

জড়বাদী দর্শন, নাস্তিকতা এবং অন্যকোন বিকৃত ভাবাদর্শ অথবা দর্শন এর পক্ষে ওকালতি করতে পারে না। এমনকি যদি তারা এর পক্ষে ওকালতি করতেও থাকে, তবে এটা একটি আবেগাত্মক জিদ, যেহেতু এ বইগুলো তাদের ভাবাদর্শকে ভিত্তি মূল থেকে খণ্ডন করে দিয়েছে। আজকে অস্বীকৃতির সব আন্দোলন ভাবাদর্শগতভাবে পরাজিত, হারুন ইয়াহিয়া লিখিত বই সমষ্টির জন্য ধন্যবাদ।

সন্দেহ নেই যে, এই রচনাবলি কোরআনের প্রজ্ঞা ও প্রাঞ্জলতা থেকে উৎসারিত। লেখক নিশ্চয়ই নিজকে নিয়ে গর্বিত অনুভব করেন না। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর সঠিক পথ অনুসন্ধান করার উপায় হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করেন। তার উপর এই রচনাবলির প্রকাশনায় কোন বস্তুগত প্রাপ্তি যাচনা করা হয় নাই।

এসব সত্য বিবেচনা করে যারা মানুষকে বইগুলো পড়তে উৎসাহ দান করে, যে বইগুলো হৃদয়ের চোখ খোলে দেয় এবং আল্লাহর অনুরক্ত দাস হতে পরিচালনা করে তারা অমূল্য সেবা দান করেন।

ইতিমধ্যে অন্যান্য বই যা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা প্রচার করা সময় ও শক্তি বিনষ্ট করা, মানুষকে ভাবাদর্শগত বিভ্রান্তি এর দিকে পরিচালিত করা এবং মানুষের হৃদয় থেকে সন্দেহ দূর করতে পরিষ্কারভাবে কোন শক্তিশালী এবং নির্ভুল প্রভাব ফেলে না, যা পূর্বতন অভিজ্ঞতা থেকে সত্যাসত্য যাচাই করা হয়েছে। এটা স্পষ্টত প্রতীয়মান যে, ধর্মহীনতা থেকে মানুষকে রক্ষার মহৎ লক্ষ্যের চেয়ে লেখকের সাহিত্যিক ক্ষমতার উপর জোর দিতে যে বইগুলো রচনা করা হয়েছে তার দ্বারা এরূপ প্রভাবফেলা অসম্ভব। যারা এটা সন্দেহ করেন তারা অনায়াসে দেখতে পান যে হারুন ইয়াহিয়ার বই-এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবিশ্বাসকে পরাভূত করা এবং কোরআনের নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার করা। যে সাফল্য, প্রভাব ও আন্তরিকতা এই সার্ভিস পেয়েছে তা পাঠকের প্রত্যয়ে স্পষ্টত প্রতীয়মান।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার ঃ চলমান নিষ্ঠুরতা ও সংঘাত এবং বেশির ভাগ লোক যে অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তার প্রধান কারণ অবিশ্বাসের আদর্শগত ব্যাপকতা। এই বিষয় নাস্তিকতার আদর্শগত পরাজয়ের মাধ্যমে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সৃষ্টির অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে জানে এবং কোরানের নৈতিকতা যাতে এর অনুসরণে জীবন যাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সমাপ্তি লাভ করতে পারে। আজকের পৃথিবীর অবস্থা বিবেচনা করে, যা মানুষকে সহিংসতা, দুর্নীতি ও সংঘাতের নিম্নগামী পেঁচে জোরপূর্বক নিক্ষেপ করে, এটা পরিষ্কার যে এই সার্ভিস আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে প্রদান করতে হবে। অন্যথায় অনেক দেরি হয়ে যাবে।

এটা বলা অতিরঞ্জিত নয় যে হারুন ইয়াহিয়ার বই সমষ্টি এই নেতৃত্বদানকারী ভূমিকা দায়িত্ব নিয়েছে। আল্লাহ চাহেত এই বইগুলো কোরআনে অঙ্গীকারকৃত শান্তি ও আশীর্বাদ, সুবিচার ও সুখ লাভ করতে একবিংশ শতাব্দিতে মানুষের উপায় হবে।

গ্রন্থকারের রচনাবলিতে অন্তর্ভুক্ত ঃ নতুন রাজমিস্ত্রি সংক্রান্ত বিন্যাস, ইহুদীবাদ, ফ্রিম্যাসনদের রীতিনীতি প্রতিষ্ঠানসমূহ, গ্লোবাল ফ্রিমাসনারী, ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে নিন্দা

জানায়, সন্ত্রাসবাদ ঃ শয়তানের আচার-অনুষ্ঠান, মানুষের প্রতি আনিত ডারউইনবাদের বিপর্যয়। সন্ত্রাসবাদ ঃ ভাবউনবাদের ব্লাডি ভাবাদর্শ। "বসনিয়ায় গোপন হস্ত" ধ্বংসযজ্ঞের তামাশা, সন্ত্রাসবাদের, পর্দার অন্তড়ালে, ইসরাইলে কুর্দিশ কার্ড, তুরস্কের বিরুদ্ধে ডারউইনের বৈরীতা, বিবর্তন প্রবঞ্চনা, বিধ্বংস জাতীসমূহ, সোনালী যুগ, আল্লাহর রঙ-এর আর্ট, পার্থিব জীবনের সত্যকথা, বিবর্তনবাদ বাদীদের স্বীকারোক্তি, বিবর্তনবাদবাদীদের মহাভ্রান্তি, ডারউইনবাদের কালো যুগ, ডারউইনবাদের ধর্ম, কোরআন বিজ্ঞানের পথে পরিচালিত করে, প্রাণের প্রকৃত উৎপত্তি, কোরআনের অলৌকিকত্ব, প্রকৃতিতে ডিজাইন, প্রাণীর বুদ্ধিমত্তার আচরণের মডেল, চিরন্তনতা ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছে, শিশুদের ডারউইন ভূতলশায়ী, ডারউইনবাদের সমাপ্তি, বিশ্বব্রমান্ডের সৃষ্টি, ভাবনার গভীরে, সময়হীনতা এবং ভাগ্যের বাস্তবতা, কখন অজ্ঞানতা পক্ষ সমর্থন করেনা, পরমাণুর অলৌকিকত্ব, জীবকোষে অলৌকিকত্ব, চোখে অলৌকিকত্ব, উদ্ভিদে অলৌকিকত্ব, সৃজনজনিত অলৌকিকত্ব, মাকড়সায় অলৌকিকত্ব, পিপিলিকায় অলৌকিকত্ব, ডাঁশমশার অলৌকিকত্ব, মৌমাছির অলৌকিকত্ব।

তাঁর পুস্তিকাসমূহের মধ্যে পরমাণুর রহস্য, বিবর্তনবাদ মতবাদের ধ্বংস, জড়বাদের সমাপ্তি, বিবর্তনবাদপন্থীদের ভ্রান্তি-১, বিবর্তনবাদ পন্থীদের ভ্রান্তি-২, বিবর্তনের অনুজীব বিজ্ঞানসম্মত ধ্বস, সৃষ্টির সত্য, বিশটি প্রশ্নে বিবর্তনবাদ মতবাদের ধ্বস, জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে সর্ব বৃহৎ প্রবঞ্চনা, ডারউইনবাদ।

গ্রন্থকারের কোরআনের বিষয়ের উপর অন্যান্য রচনাকর্ম-সত্য সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেছ? আল্লাহর প্রতি নিবেদিত, অজ্ঞতা সমাজের অপসৃয়মান, জান্নাত, বিবর্তন মতবাদ, কোরআনের নৈতিকতাবোধ, কোরআনের জ্ঞান, কোরআন ইনডেক্স, আল্লাহর জন্যে দেশত্যাগ করা বা হিযরত করা, কোরআনের মোনাফিকদের চরিত্র, মোনাফিকদের গোপন কথা, তর্কবিরোধ পথ, আল্লাহর নামশূন্য, কোরআনের শিক্ষণীয় বার্তা সঞ্চার, কোরআনের মূল ধারণা, কোরআন থেকে জওয়াব, মৃত্যু পুনরুত্থান, জাহান্নাম, দূতদের সংগ্রাম, মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তান, মূর্তিপূজা, অজ্ঞদের ধর্ম, শয়তানের ঔদ্ধত্য, কোরআনে প্রার্থনা, কোরআনে বিজ্ঞানের গুরুত্ব, পুনরুত্থানের দিন, কখনও ভুলনা, কোরআনের অবহেলিত বিচার, অজ্ঞদের সমাজে মানুষের চিত্র, ধৈর্য্যের গুরুত্ব, কোরআন থেকে তথ্য, বিশ্বাসের দ্রুত উপলব্ধি ১, ২, ৩, পরিণত বিশ্বাস, তোমার দুঃখ প্রকাশের পূর্বে, আমাদের দূতগণ বলেন, ঈসা আসবেন, জীবনের জন্য কোরআনের সৌন্দর্য্য উপহার, অবিশ্বাসের দুঃস্বপ্ন, পরীক্ষার গোপন কথা, কোরআন অনুসারে সত্যিকারের প্রজ্ঞা, অধর্মের সাথে ধর্মের সংগ্রাম, ইউসুফের বিদ্যালয়, ইতিহাসের সর্বত্র, ভাল শব্দের অনুসরণের গুরুত্ব, আল্লাহর সৌন্দর্য্যের কুসুমস্তবক।

সূচিপত্র

অবতরণিকা / ১০

ভাবনার গভীরে / ১৪

মানুষ সচরাচর কী সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে? / ২২

কী কারণসমূহ চিন্তায় বাধা প্রদান করে ? ২৬

যে সব বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন / ৩৬

কোরআনের আয়াতসমূহ চিন্তা করা / ৭৪

উপসংহার / ৮৬

বিবর্তন প্রবঞ্চনা / ৮৮

অবতরণিকা

মাতৃগর্ভে আসার এবং তারপর পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পূর্বে আপনি যে একদিন ছিলেন না, এই সত্য সম্বন্ধে কখনও ভেবে দেখেছেন এবং (ভেবেছেন কি) যে, আপনি মাত্র 'কিছুই-না' থেকে আপন অস্তিত্বে আবির্ভূত হয়েছেন?

আপনি কি কখনও এই সম্বন্ধে ভেবেছেন যে, প্রতিদিন আপনার দিনের বেলায় কাজ করার কক্ষটিতে কেমনে ফুলসমূহ আলকাতরা-কালো, কর্দমাক্ত মাটি থেকে সুবাসিত ঘ্রাণ নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং এগুলো দেখতে খুবই মনোহর।

কখনও ভেবে দেখেছেন কি করে মশককূল যা বিরক্তিকরভাবে আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের ডানাগুলো এত দ্রুত নাড়ায় যে, আমরা তাদের দেখতে পাই না?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন কিভাবে ফলের খোসা যেমন কলা, তরমুজ, ফুটি এবং কমলার উন্নতমানের আবরণী হিসেবে কাজ করে এবং কিভাবে ফল এ আবরণীর ভেতর আবদ্ধ থাকে যাতে সেগুলোর স্বাদ, গন্ধ সংরক্ষিত হয়?

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন এমন সম্ভাবনার কথা যখন আপনি নিদ্রামগ্ন, সহসা ভূমিকম্পে আপনার বাড়ি, আপনার অফিস এবং আপনার (গোটা) শহরটি মাটিতে ধূলিস্যাত হয়ে গেল এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি দুনিয়ার যা কিছুর মালিক তা হারাতে পারেন?

আপনি কখনও ভেবেছেন কি, কেমনে আপনার জীবন দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি বার্ধক্যে উপনীত হবেন ও দুর্বল হয়ে পড়বেন এবং ধীরে ধীরে আপনার সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাবেন?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন যে, একদিন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা আপনার সম্মুখে হাজির হবেন এবং তখন আপনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন?

ভাল কথা, আপনি কি কখনও সেই লোকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছেন, যারা দুনিয়ার প্রতি কেন এত বেশি জড়িত, যা থেকে তারা শীঘ্রই অন্তর্ধান করবে (এবং) যখন মূলতঃ পরকালের জন্য যা প্রয়োজন তার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাবে?

মানুষ এমন একটি জীবিত সত্ত্বা যাকে আল্লাহ চিন্তাশক্তি দান করেছেন। তবুও অধিকাংশ লোক এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা যতটুকু সমীচিন ততটুকু ব্যবহার করেন না।

সত্য কথা হল প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা করার মত ধীশক্তির অধিকারী, যার সম্বন্ধে এমনকি নিজেই অবহিত নয়। মানুষ যখন একবার এই ধীশক্তি ব্যবহার করতে শুরু করেন, সত্য যা তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না যতক্ষণ না ঠিক সেই মুহূর্ত পর্যন্ত তার কাছে উন্মোচিত হতে শুরু করে। অনুধ্যানের যতই গভীরে তিনি যান ততই তার চিন্তা

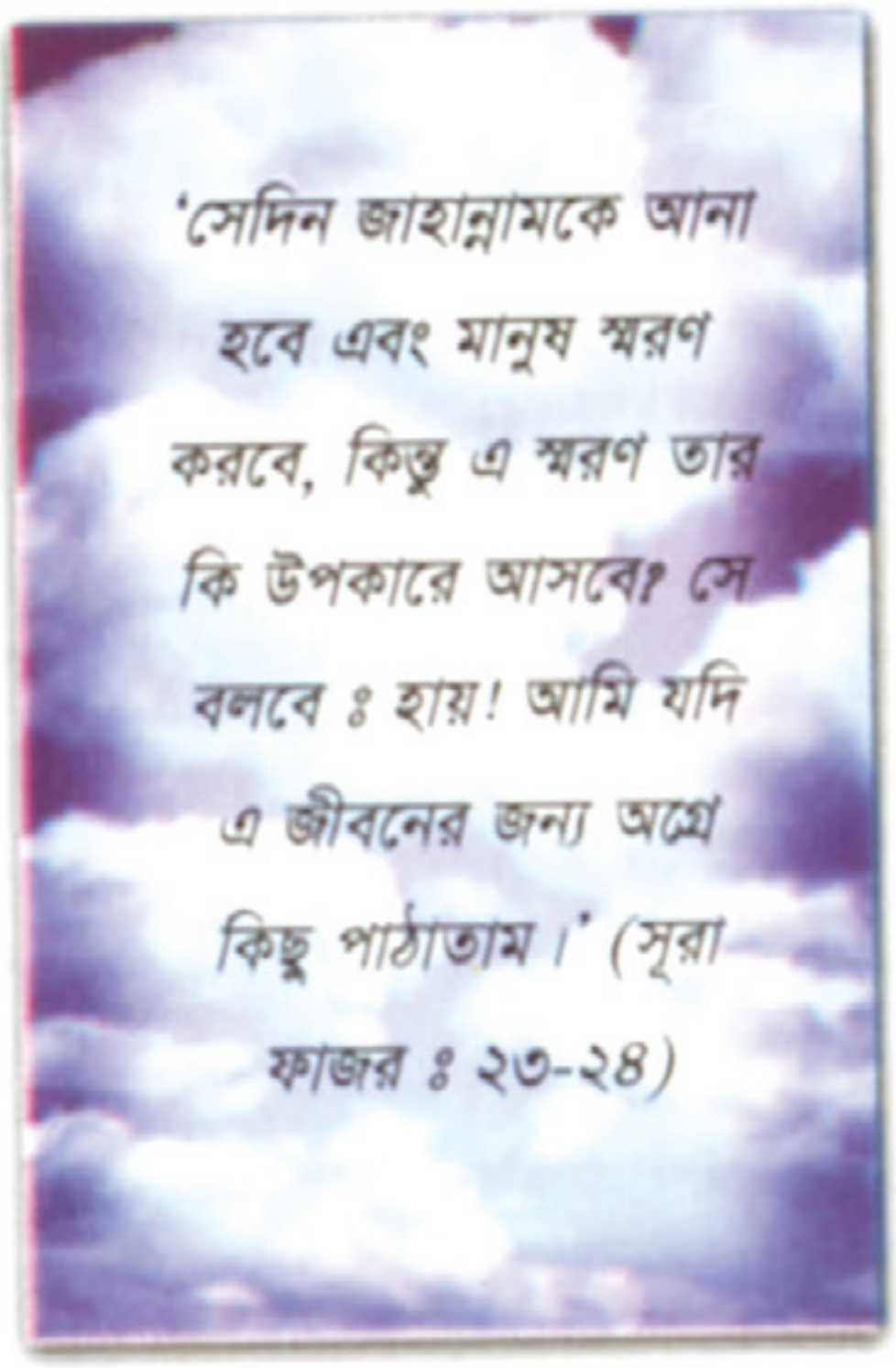

করার ধীশক্তির উৎকর্ষ সাধন করেন এবং তা প্রত্যেকের জন্য সম্ভব। একজনকে ঠিকই উপলব্ধি করতে হবে যে, তার চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন এবং তারপর কঠোর সংগ্রাম করতে হবে। এই বইয়ের অভীষ্ট লক্ষ্য হল মানুষকে 'চিন্তা-ভাবনা করা যেমন তাদের উচিত' এর প্রতি আহ্বান করা এবং 'চিন্তাকরণ যা তাদের জন্য সমীচিন' এর পথ প্রদর্শন করানো। যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করেন না তিনি সম্পূর্ণরূপে সত্য থেকে দূরে থাকেন। তার জীবন আত্মপ্রবঞ্চনা ও ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করেন। ফলে, তিনি পৃথিবীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং পৃথিবীতে তার অস্তিত্বের যুক্তি সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পারেন না। অথচ আল্লাহ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রত্যেক বস্তুই সৃষ্টি করেছেন। এই সত্য যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

'আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যেকার প্রত্যেকটি বস্তু খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করি নাই। আমি তাদেরকে অকারণে সৃষ্টি করি নাই। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানেন না'। (সূরা-দোখান, আয়াত ৩৮-৩৯)

'তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি আমোদ-প্রমোদের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না?' (সূরা আল মোমেনুন ঃ ১১৫)

অতএব, প্রত্যেক ব্যক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভেবে দেখা প্রয়োজন, প্রথমতঃ যেহেতু এটা তার নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং তারপর যেহেতু তিনি বিশ্বে যা কিছু দেখেন তা প্রত্যেক বস্তুর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার যা তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। যখন তিনি আল্লাহর সম্মুখে হিসাব দিবেন, কিন্তু এটা তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে। আল্লাহ কোরআনে বলেন যে, হিসাব নিকাশের জন্য (হাশরের দিন) প্রত্যেক ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করবে এবং সত্য দেখতে পাবে।

আল্লাহ যখন আমাদেরকে এই পার্থিব জীবনে সত্যকে দেখে তা চিন্তা করার ও চিন্তা-ভাবনা থেকে উপসংহার টানার সুযোগ দিয়েছেন, আমাদের পরকালের জীবনে

বিরাট প্রাপ্তি আনয়ন করবে। এ জন্য আল্লাহ তার রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে সকল মানুষকে তাদের সৃষ্টি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির ওপর চিন্তা-ভাবনা করতে আহ্বান করেছেন ঃ

> *'তারা কি নিজ অন্তরে মনোনিবেশ করে নাই যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যেকার সব কিছুই ন্যায়ভাবে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য; কিন্তু মানুষের অধিকাংশ আল্লাহর সমীপে উপস্থিতি অস্বীকার করে।'*
> *(সূরা রূম ঃ ৮)*

ভাবনার গভীরে

অধিকাংশ লোক মনে করেন যে "গভীর চিন্তা" করতে হলে তার একটি পদ্ধতি হল, একজনের মাথা তার দুই হস্তদ্বয়ের মাঝে রাখতে হবে, নির্জন কামড়ায় নিজেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং নিজেকে অন্যান্য লোকজন ও কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে হবে। সত্য কথা হল, তারা এমন "গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা" করা এর মত উচ্চস্তরের ভাবনা খুব কঠিন বলে দেখতে পান এবং শেষে সিদ্ধান্তে আসেন যে এটি একটি বিশেষ গুণ যা একচেটিয়াভাবে কেবল "দার্শনিক" গণের জন্যই প্রযোজ্য।

যাহোক আমরা যেমন ভূমিকায় বলেছিলাম যে আল্লাহ লোক সকলকে অনুধ্যান করতে আহ্বান করেন এবং বলেন যে তিনি কোরআনকে নাযিল করেছেন তার উপর অনুধ্যান করতে ঃ *"এটি একটি কিতাব আমি আপনার প্রতি নাজিল করেছি, আশীর্বাদে পরিপূর্ণ ; অতএব বুদ্ধিমান লোকেরা এর আয়াতসমূহ ভেবে দেখুক ও অনুধাবন করুক। (সূরা সাদ ঃ আয়াত ২৯)* যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল একজনের চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতার আন্তরিক উন্নয়ন এবং চিন্তার গভীরতর প্রদেশে গমন করা।

অপরপক্ষে, যে সকল ব্যক্তি ঐ লক্ষ্যে প্রয়াস চালান না, তারা তাদের জীবন গভীর "অনাবধানতা" এর মধ্যে চালিয়ে যান।" "অনাবধানতা" শব্দটি "না ভুলিয়া অবহেলা", "ইচ্ছা বা আবেগের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করা", "অগ্রাহ্য করা", "নির্লিপ্ত হওয়া" এর ব্যঞ্জনা বুঝায়। যে সকল লোক চিন্তা-ভাবনা করেনা, তাদের মনের অনাবধানতার অবস্থার বিষয়টি ভুলে যাবার অথবা তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং বাস্তবতা যা ধর্ম শিক্ষা দেয় তা ইচ্ছাকৃতভাবে অগ্রাহ্য করা তার ফলাফল। তথাপি এটা একটি চরম ভয়ঙ্কর পথ যা নরকের দিকে ধাবিত করে। প্রসঙ্গত, আল্লাহ মানুষকে অনাবধানগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হতে সতর্ক করে দিয়েছেন।

> *"স্মরণ কর বিনয়ের ও ভীতির সাথে আপন মনে তোমাদের প্রভুকে, অনুচ্চস্বরে সকাল ও সন্ধ্যায়। তুমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।"*
>
> *(সূরা আরাফ ঃ আয়াত ২০৫)*

> *"তিক্ত আক্ষেপের দিন সম্বন্ধে আপনি তাদেরকে সতর্ক করে দিন যখন চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেয়া হবে কিন্তু তারা কোন ভ্রুক্ষেপ করে না এবং তারা ঈমান আনেনা।" (সূরা আল মরিয়ম ঃ আয়াত ৩৯)*

কোরআনে আল্লাহ ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন যারা অনুধ্যান করে এবং যারা বিবেক বুদ্ধিসহকারে অনুধ্যানের পর সত্যকে দর্শন করে এবং সে কারণে তাকে (আল্লাহকে) ভয় করে আল্লাহ বলেন যে, যারা কোন কিছু না ভেবে, অন্ধভাবে না ভেবে তাদের পূর্বপুরুষকে ঐতিহ্যগত কারণে অনুসরণ করে, তারা বিভ্রান্তির মধ্যে আছে।

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন এই সকল লোক বলে থাকে তারা ধার্মিক, আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তবু যেহেতু তারা চিন্তা-ভাবনা করেনা তারা আল্লাহর ভয়ে তাদের আচার-আচরণ সংশোধন করে না।

নিম্নবর্ণিত আয়াতে এই সকল লোকদের মানসিকতা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে ঃ

বলুন ঃ "এই পৃথিবীর এবং যারা এতে আছে তারা কার বল, যদি তোমাদের কোন জ্ঞান থাকে।"

তারা বলবে ঃ "আল্লাহর, অতএব তোমরা কেন অনুধাবন কর না? বলুন ঃ কে সাতটি আসমান এবং বিশাল সিংহাসনের মালিক?

তারা বলবে, আল্লাহ বল ঃ অতএব তোমাদের কি তাকওয়া থাকবে না?

(তাকওয়া আল্লাহর প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয় যা এক ব্যক্তিকে ভুল কাজ থেকে রক্ষা করে এবং এরা তেমন কাজের জন্য উদগ্রীব যা তাঁকে (আল্লাহকে) খুশী করে।)

"বলুন কার হস্তে প্রত্যেক বস্তুর আধিপত্য? তিনি যিনি নিরাপত্তা বিধান করেন এবং যার থেকে কেউ নিরাপত্তা পেতে পারেনা। যদি তোমাদের কোন জ্ঞান থাকে?"

তারা বলবে, "আল্লাহ"র, অতএব কেমনে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ? সত্য কথা হল যে আমি তাদের কাছে সত্য পৌছিয়েছি এবং তারা মিথ্যাবাদী।

(সূরা আল মুমিনুন ঃ ৮৪-৯০)

চিন্তা-ভাবনা মানুষের উপর থেকে মোহাচ্ছন্নতা (যাদু মন্ত্র দ্বারা বশীকরণ বা সম্মোহন) দূর করে

উপরে উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ মানুষকে জিজ্ঞাসা করেন "অতএব, কেমনে তোমরা সম্মোহিত হলে?" এই আয়াতে "সম্মোহিত" শব্দ দ্বারা এক প্রকার মানসিক অসাড়তার ইঙ্গিত দেয় যা সামগ্রিকভাবে মানুষকে তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। চিন্তাভাবনাহীন ব্যক্তির মন নিঃস্বার, তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়, তিনি কাজ করেন যেন তিনি তার চোখের সামনে প্রকৃত ঘটনা (সত্যতা) দেখতে পাননা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি এমনকি একটি সহজ সত্য উপলব্ধি করতে অসমর্থ হন। তিনি তার ডান পার্শ্বে যে সব, অসাধারণ ঘটনা ঘটছে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকতে ব্যর্থ হন। তিনি দুর্বোধ্য ঘটনাসমূহের খুঁটিনাটিতে দৃষ্টি দেন না। হাজার হাজার বছর যাবত মানুষের অনবধান জীবন যাপনের এবং সামগ্রিকভাবে চিন্তা-ভাবনা থেকে দূরে সরে থাকা যেন এটা কেবল একটি সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, প্রকৃতপক্ষে তার কারণেই এই মানসিক অসাড়তা।

আমরা উদাহরণসহ এই সামষ্টিক মোহাচ্ছন্নতার পরিণতি একটি ব্যাখ্যা করতে পারি ঃ

পৃথিবীর উপর পৃষ্ঠের নিচে ম্যাগমা নামে একটি ফুটন্ত (অগ্নিতাপে) স্তর থাকে পৃথিবীর কঠিন আবরণ অত্যন্ত পাতলা, যাহা ইঙ্গিত দেয় এই প্রজ্বলিত আগুন আমাদের খুবই কাছাকাছি, প্রায় আমাদের পায়ের পাতার নিচে। পৃথিবীর এই পাতলা আবরণ কেমন তা ভালভাবে বুঝার জন্য আমরা একটি তুলনা করতে পারি ঃ পৃথিবীর আবরণের পুরুত্ব ও সমগ্র পৃথিবীর অনুপাত একটি আপেলের খোসার পুরুত্ব সমগ্র আপেলটির অনুপাতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

প্রত্যেকেই জানেন যে পৃথিবীর আবরণীর ঠিক নিচে অত্যন্ত উষ্ণতাপ মাত্রায় একটি ফুটন্ত স্তর আছে কিন্তু, এ সম্বন্ধে খুব একটা বেশি চিন্তা করেনা। এর কারণ তাদের পিতামাতা, ভাই, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী, যে পত্রিকা তারা পাঠ করেন তার সাংবাদিক টিভি প্রোগ্রাম প্রযোজক এবং তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ সম্বন্ধে কেহই চিন্তা করেন না।

আসুন আমরা আপনাকে এর উপর সামান্য চিন্তা করার জন্য চেষ্টা করি। আসুন আমরা ধরে নেই যে এক ব্যক্তি তার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে তার প্রতিবেশ জানার জন্য তার চারিদিকের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রয়াস করেন। এই ব্যক্তি সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করবেন তিনি কোথায় আছেন। যদি তাকে বলা হয়, যে মাটির উপর তিনি দাঁড়িয়ে আছেন তার নিচেই আছে এক জ্বলন্ত আগুনের গ্লোব এবং যা এই অগ্নিশিখা শক্তিশালী ভূমিকম্প কিংবা আগ্নেয়গিরি এর উদগীরনের ঘটনায় পৃথিবী আবরণী ভেদ করে ফেটে বাইরে নির্গত হতে পারে, তখন তিনি কি ভাববেন? আসুন আমরা আরও অগ্রসর হই এবং মনে করি যে, এই ব্যক্তিকে বলা হল যে এই পৃথিবী একটি সাধারণ ক্ষুদ্র গ্রহ এবং এটি ভেসে আছে অসীম কৃষ্ণ শূন্যে যাকে বলা হয় স্পেস বা মহাশূন্য এবং সেই মহাশূন্য পৃথিবীর স্তর থেকেও ভয়ঙ্কর বিপদ ধারণ করে। উদাহরণস্বরূপ উলকা যার ওজন (বহুসংখ্যক) টন তা এর ভেতর চারদিকে স্বাধীনভাবে ঘুরছে। কেন তাদের গতিপথ পরিবর্তন করছে না, তার কারণ নেই, সম্ভবত অন্য গ্রহের অভিকর্ষীয় শক্তির প্রভাবে এবং পৃথিবীর সাথে পরস্পর সংঘর্ষ বাধে এই কারণেই।

নিশ্চয়ই ঐ ব্যক্তি, এমনকি এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে সক্ষম হবে না যে, সে কি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে আছেন। তার অন্বেষণ করা উচিত কেমনে লোকেরা তাদের জীবন যাপন এই পরিবেশের বিপরীতে করে থাকেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, একটি নিখুঁত পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করেছে। যে গ্রহে তিনি বাস করেন তার ভেতর মহাবিপদ ধারণ করে, তবু খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্যতা এই বিপদকে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি করতে বাধা প্রদান করে, কেবলমাত্র অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতীত। যে ব্যক্তি এই বোধ উপলব্ধি করেন যে পৃথিবী এবং সকল প্রাণী যা তার উপর বাস করে জীবন যাপন নিরাপদে চালিয়ে যায় কেবল আল্লাহর ইচ্ছায়, তাঁর (আল্লাহর) সৃষ্ট নিখুঁত ভারসাম্যতার কারণে।

এই উদাহরণ কেবল মিলিয়নের মধ্যে একটি, এমনকি তদ্রূপ বিলিয়ন সংখ্যক উদাহরণ আছে যার উপর মানুষের ভেবে দেখা দরকার। আর একটি উদাহরণ প্রদান করা আমাদের জন্য বুঝতে কাজে লাগবে, কেমনে অনাবধানতা মানুষের চিন্তা-ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং বুদ্ধিবৃত্তি গত ক্ষমতা দমিয়ে রাখে।

মানুষ জানে এই পার্থিব জীবন এগিয়ে যায় এবং খুব দ্রুত পরিসমাপ্তি লাভ করে, তথাপিও তারা এমন আচরণ করে যেন কখনও এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে না।

তারা এমনভাবে কাজ করে যেন পৃথিবীতে মৃত্যু বলে কিছুই নেই। সত্যি বটে, এটি এক প্রকার সম্মোহন যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হয়। এটির প্রভাব এমন শক্তিশালী যে, যখন কেউ মৃত্যু সম্বন্ধে কথাবার্তা বলে, তখন সকল ব্যক্তি তাদের উপর সম্মোহনের প্রভাব কেটে যাবার এবং বাস্তবতার সম্মুখীন হবার ভয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টির আলোচনার সমাপ্তি ঘটান। যে সব ব্যক্তি, মনোরম বাড়ি-ঘর, গ্রীষ্মকালীন বাসভবন এবং গাড়ি ও ভাল স্কুলে সন্তানদের পাঠাতে তাদের সমগ্র জীবন নিঃশ্বেস করে দেন, তারা যে একদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং গাড়ি, বাড়ি অথবা সন্তানাদি সাথে নিয়ে যেতে পারবে না তারা তা ভাবতে চান না।

ফলত ঃ মৃত্যুর পর বাস্তব জীবনের জন্য কিছু করতে শুরু করার চেয়ে না ভাবতেই পছন্দ করেন। যাহোক প্রত্যেক ব্যক্তি একদিন না একদিন অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে এবং একজন মৃত্যুর পর কেউ বিশ্বাস করুক বা নাই করুক তার অনন্ত কালের জীবন শুরু হবে। এই অনন্ত কালের জীবন বেহেশতে কাটবে না দোজখে কাটবে তা নির্ভর করবে স্বল্পকালীন পার্থিব জীবনে একজন কি কাজ করেছে। যখন এটাই সহজ, সত্য, কেন লোকজন এমন আচরণ করে যেন মৃত্যুর কোন অস্তিত্ব নেই। তার কারণ এই মোহাচ্ছন্নতা যা তাদেরকে ঢেকে ফেলেছে, কারণ তারা চিন্তা-ভাবনা করেনা।

যারা চিন্তা-ভাবনা দ্বারা এই মোহাচ্ছন্নতা এবং অতএব অমনোযোগীতা অবস্থা থেকে তাদের নিজেদের রক্ষা করতে পারে না তারা মৃত্যুর পর তাদের চোখ দ্বারা সত্যসমূহ দেখে বুঝতে পারবে। আল্লাহ কোরআনের মাধ্যমে এই সত্য অবহিত করেন ঃ

"তুমি তো এ দিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে, তাই আমি তোমাদের আচ্ছাদন সরিয়ে দিয়েছি এবং আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ।" (সূরা কাফ-২২)

যেমন আল্লাহ এই আয়াতে বলেন, যে চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে দৃষ্টি যা এখানে ঝাপসা, তা এমন সময় তা তীক্ষ্ণ হবে যখন মৃত্যুর পর পরকালে হিসাব পেশ করবে।

এটা উল্লেখ করা উচিত, মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে এরূপ মোহাচ্ছন্নতা নিজেদের উপর চাপিয়ে থাকে। তারা মনে করে এরূপ করে তারা আরামের ও প্রশান্তি পূর্ণ জীবন যাপন করবে। যাহোক, যেকোন একজনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া মানসিক অসাড়তা ঝেড়ে ফেলা ও পরিষ্কার সচেতনতার সাথে বেঁচে থাকতে শুরু করা খুবই সহজ। আল্লাহ মানুষদের নিকট সমাধান প্রদান করেছেন, যে সব ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে তারা পৃথিবীতে বেঁচে থাকাকালীন এই মোহিনী শক্তিকে দূর করতে পারেন। তার বুঝতে পারে সকল ঘটনার একটি উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহিত অর্থ থাকে এবং প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ যেসব ঘটনা ঘটান তাতে প্রজ্ঞা দেখতে পান।

একজন যে কোন সময়ে এবং যে কোন স্থানে চিন্তা করতে পারেন

চিন্তা-ভাবনা করার জন্য কোন সময় স্থান অথবা অবস্থার প্রয়োজন পড়েনা। যে কোন ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে রাস্তায় হাঁটার সময়, অফিসে যেতে যেতে, গাড়ি চালিয়ে কম্পিউটারে কাজ করার অবস্থায়, বন্ধুর ডাকার সমাবেশে হাজির হওয়ার সময়, টিভি দেখা অথবা ভোজনের সময়।

উদাহরণস্বরূপ গাড়ি চালানোর সময় বাইরে শত শত লোক দেখা যায়। যিনি এ সব লোক দেখেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবতে পারেন। তার মনে উদয় হতে পারে যে এ সব শত শত লোকদের দৈহিক মুখায়বর সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন রকমের। এই লোকজনের কেউ একে অন্যের মত দেখায় না। এটা আশ্চর্যজনক যে যদিও এই লোকদের মূলতঃ একই রকম অঙ্গ যেমন চোখ, চোখের ভ্রু, চোখের চুল, হাত, বাহু পা, মুখমন্ডল এবং নাক, তারা পরস্পর একজন থেকে আরেকজন বিভিন্ন রকমে দেখায়, আর সামান্য বেশী চিন্তা করলে একজন নিম্নলিখিত বিষয় স্মরণ করেন ঃ

আল্লাহ বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে সৃষ্টি করেছেন যারা সবাই একজনের থেকে অন্য জন ভিন্ন রকমের। আল্লাহ যে কত শ্রেষ্ঠ ও প্রবল ক্ষমতাধর স্রষ্টা এটা তার একটি সামান্য উদাহরণ।

যে ব্যক্তি এ সব লোকজনকে দলে দলে ছুটে যেতে দেখে তিনি বিভিন্ন চিন্তায় আপ্লুত হতে পারেন। প্রথম দৃষ্টিতে এ সব লোকজন প্রত্যেককে স্বতন্ত্র লোক মনে হবে। তাদের প্রত্যেকের তার নিজস্ব জগৎ ইচ্ছা পরিকল্পনা জীবন যাত্রার ধারা, টপিক যা সুখী বা অসুখী করে এবং রুচি থাকে। তথাপি এই বিভিন্নতা বিভ্রান্তিকর। সাধারণত প্রত্যেক মানুষ, জন্ম নেয়, বেড়ে উঠে, স্কুলে যায়, চাকরির অন্বেষণে যায়, কাজ করে, বিয়ে করে, সন্তান থাকে, এই সন্তানদের স্কুলে পাঠায় বিয়ে দিয়ে বিদায় করে, বয়স্ক হয়। দাদা (নানা) বা দাদী (নানী) হয় এবং শেষে মারা যায়। এরূপ দৃষ্টিতে মানুষের জীবনধারার মধ্যে কোন ভিন্নতা নেই। একজন ইস্তাবুলের পার্শ্ববর্তী অথবা মেক্সিকো শহরে যেখানে বাস করুক না কেন তার

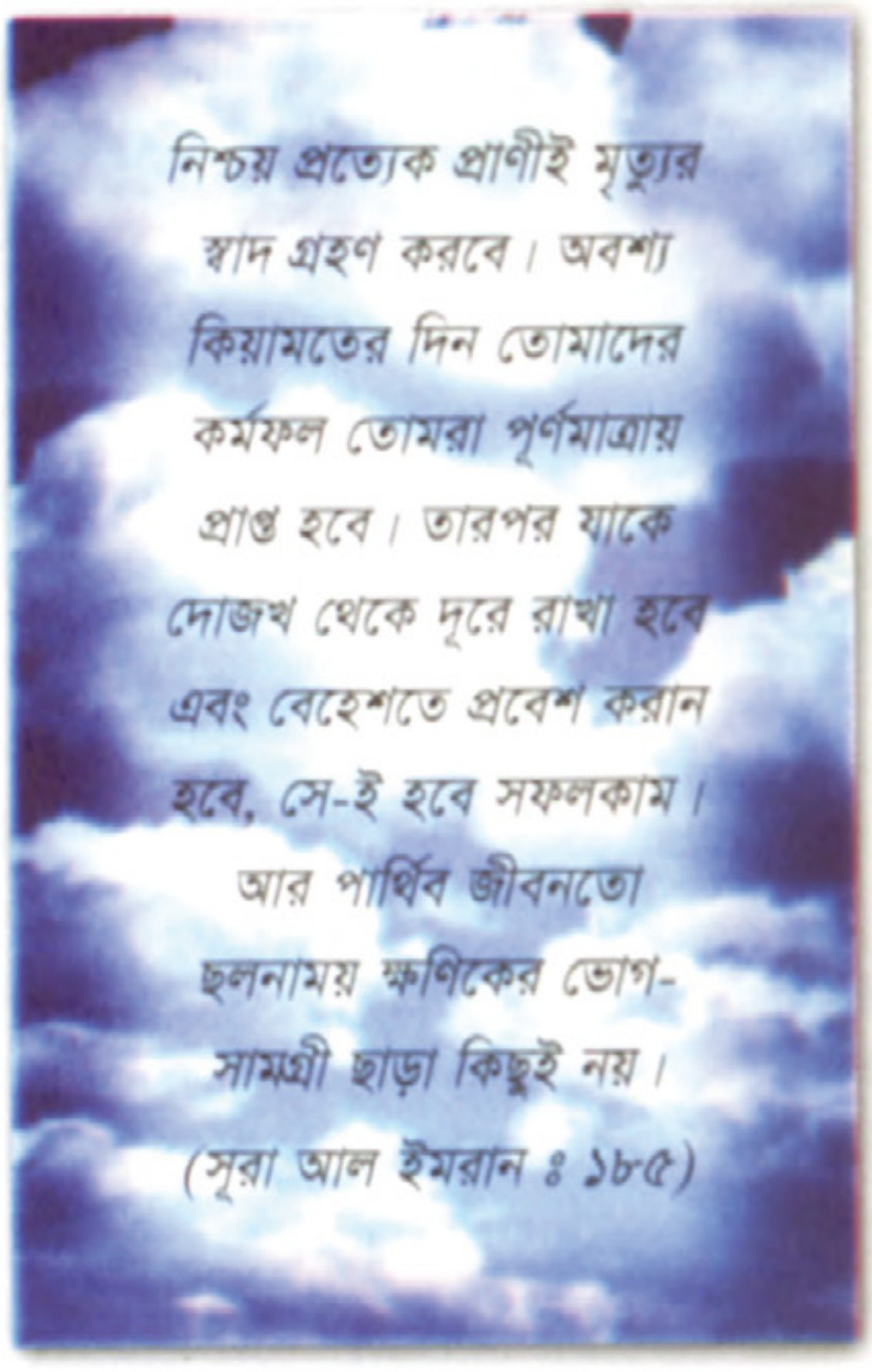

মধ্যে কোন কিছুর মোটেই পরিবর্তন হয় না। এই মানুষগুলোর সবাই একদিন না একদিন ইন্তেকাল করবে। এক শতাব্দী পরে সম্ভবত তাদের মধ্যে একজনও জীবিত থাকবে না। যে ব্যক্তি এ সব উপলব্ধি করে, চিন্তা-ভাবনা করে চলে সে নিজেকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করে—"যেহেতু আমাদের সবাই একদিন মৃত্যুবরণ করবে, তবে কেন প্রত্যেক ব্যক্তি এমনভাবে কাজ করে যে যেন তারা কখনও পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে না? যখন একজন ব্যক্তি যার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে গেছে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য সংগ্রাম করতে চায়, এ কেমন যে প্রায় সকল ব্যক্তি এমন ভাব দেখায় যেন তাদের এ পার্থিব জীবন কখনও শেষ হবে না?"

তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি চিন্তা করেন এবং তার চিন্তা থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছে থাকেন।

বেশির ভাগ লোক এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবেন না। যদি তাদের হঠাৎ জিজ্ঞাসা করা হয়, "এই মুহূর্তে আপনি কি ভাবছেন? দেখা যাবে, তারা তাদের তেমন বেশি কাজে লাগবে না এরূপ অতিশয় অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে ভাবছে। যাহোক মানুষ, "অর্থপূর্ণ" "বিজ্ঞ" এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিয়ে প্রতি মুহূর্তে তার জাগার (ঘুম থেকে) সময় থেকে ঘুমাতে না যাওয়া পর্যন্ত ভাবতে সক্ষম এবং তিনি কি ভাবছেন তা থেকে সিদ্ধান্ত লাভ করেন।

কোরআনে আল্লাহ আমাদের জানান যে সব অবস্থায় বিশ্বাসীরা গভীর চিন্তা করে এবং এই চিন্তা থেকে মঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত লাভ করেন।

> *"আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে জ্ঞানী ব্যক্তিগণের জন্য নিদর্শন রয়েছে ঃ যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে বসে এবং পার্শ্ব বরাবর শুয়ে এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে ঃ আমাদের প্রভু, তুমি এটা অহেতুক সৃষ্টি কর নাই। মহিমা (তোমার) অতএব আগুনের (দোজখের) শাস্তি থেকে আমাদের রক্ষা কর।*
>
> *(সূরা আল-ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)*

যেহেতু এই আয়াতে আমাদের আরও জানানো হয়েছে, বিশ্বাসীরা এমন লোক যারা গভীর চিন্তা করে, তারা সৃষ্টির অলৌকিক দিকটি দেখতে পায় এবং আল্লাহর ক্ষমতা জ্ঞান ও বিজ্ঞতায় এর উচ্চসিত প্রশংসা করেন।

আল্লাহর দিকে ফিরে আন্তরিকভাবে চিন্তা করা

একজন ব্যক্তি ধ্যানের দ্বারা উপকার পেতে এবং তাকে সঠিক সিদ্ধান্তের দিকে চালাতে, তাকে সর্বদাই ইতিবাচক চিন্তা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ—এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখে নিজেকে হীন মনে করে কারণ, তার দৈহিক অপর্যাপ্ততার কারণে, অথবা যিনি এই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে এমন চিন্তা করা, আল্লাহ অনুমোদন করেন না। তবুও এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহর অনুমোদন লাভের আশা করেন, অন্য লোকের সুন্দর চেহারা আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি বলে বিবেচনা করেন।

যেহেতু তিনি ঐ ব্যক্তির প্রতি তাকান একটি সৌন্দর্য্য হিসেবে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাতে মহা আনন্দ লাভ করেন। তিনি আল্লাহর প্রতি প্রার্থনা করেন যেন পরকালে তার সৌন্দর্য্য যেন আরও বেড়ে যায়। তিনি তার নিজের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানান পরকালে তার অকৃত্রিম ও চিরন্তন সৌন্দর্য্যের জন্য। তিনি উপলব্ধি করেন যে পৃথিবীতে মানুষ কখনও পুরোপুরি নিখুঁত হতে পারে না কারণ এই পৃথিবী একটি পরীক্ষার অংশ হিসেবে খুঁত বা অপূর্ণতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। বেহেশতের জন্য তার ব্যাকুল কামনা বেড়ে যায়। এটা নিশ্চয়ই আন্তরিক ভাবনার একটি উদাহরণ। সারা জীবন ব্যাপী মানুষ এমন বহু উদাহরণ (পরীক্ষা) এর সম্মুখীন হয়। তাকে পরীক্ষা করা হবে সে ভাল আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনা করে কিনা যাতে আল্লাহ খুশী হন তা দেখতে।

এই পরীক্ষায় তার সফল হওয়া এবং গভীর ধ্যান পরকালে অনুকূলে আসবে কি না তা নির্ভর করে তিনি যে বিষয়ের উপর ভেবে যা শিক্ষা ও সতর্কতা অর্জন করেন। সে জন্য এটা আশু কর্তব্য যে একজন ভাববে সত্যের সাথে এবং বিরামহীন ভাবে। আল্লাহ কুরআন পাকে বলেন ঃ

> *ইনিই তিনি (আল্লাহ) যিনি তোমাদের তার নিদর্শনসমূহ দেখান এবং তোমাদের প্রতি আসমান থেকে রিজিক নাজিল করেন কিন্তু কেউই উপদেশ গ্রহণ করে না কেবল তারাই ব্যতীত যারা অনুতপ্ত হয়ে তার (আল্লাহর) এর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা মু'মিন/গাফির ঃ ১৩)*

মানুষ সচরাচর কি সম্বন্ধে চিন্তা করে?

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, মানুষ যেমন তাদের করা উচিত তেমনভাবে চিন্তা করেনা এবং তাদের চিন্তাশক্তির উন্নয়ন ঘটায় না। তথাপি এখানে একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ যা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ই কিছু কিছু বিষয় একজনের জীবনে প্রতি মুহূর্তে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। একমাত্র ঘুমানোর সময় ছাড়া প্রায় এমন কোন মুহূর্ত নেই যে মানুষের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য থাকে। যাহোক এগুলোর বেশির ভাগ চিন্তা 'অকাজের', 'অন্ত:স্বারশূন্য' এবং 'অপ্রয়োজনীয়' যা একজনের পরকালের কোন কাজে আসে না, যা কোথাও কোন লক্ষ্যে নিয়ে যায় না এবং কোন মঙ্গল করে না।

যদি কেউ দিনব্যাপী কি চিন্তা করেছেন তা স্মরণে রাখার জন্য তা লিখে রাখার চেষ্টা করেন, তারপর দিন শেষে এগুলোর উপর চোখ বুলান, তিনি দেখতে পাবেন বেশির ভাগ ভাবনা কত অন্তঃস্বারশূন্য, এমনকি তিনি এদের কিছু দরকারি মনে করেন, তাঁর ভ্রান্তিতে নিপতিত হওয়া খুবই সম্ভব। কারণ, সর্বোপরি যে সব ভাবনা সঠিক বলে মনে হয় পরকালে তা কোন কাজে নাও লাগতে পারে।

ঠিক মানুষ যেমন তার দৈনন্দিন জীবনে অন্তঃস্বারশূন্য বিষয় নিয়ে সময় নষ্ট করে, সমভাবে তারা অন্তঃস্বারশূন্য চিন্তায় বৃথা সময় কাটিয়ে দেন। *মোমিনরাই বস্তুত সফলকাম ..... যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে। (সূরা আল মোমিনুন ঃ ৩)* এই আয়াতে আল্লাহ মানুষকে এক্ষেত্রে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে উপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর এই হুকুম মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে ও সত্য বলে প্রযোজ্য হয়। এর কারণ, চিন্তাকে যদি আমরা সজ্ঞানে নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহলে তা বিরামহীনভাবে আমাদের মনের ভেতর বয়ে চলে। একজন অসচেতনভাবে এক চিন্তা থেকে অন্য চিন্তায় লাফিয়ে যায়। দোকানে কেনাকাটার চিন্তা করতে গিয়ে একজন তার বাড়ির পথ কিনে ফেলবে, অকস্মাৎ তিনি দেখতে পান যে দুয়েক বছর আগের তার বন্ধুর বলার বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতেছেন। এই অপ্রয়োজনীয় ও অকাজের চিন্তা সারা দিনই বাধাবিহীনভাবে চলতে পারে।

তথাপি চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। প্রত্যেক ব্যক্তি ঐ চিন্তা করার ক্ষমতা রাখেন যা তার নিজের, তার বিশ্বাস, মন, শিষ্টাচার এবং তার পরিবেশ এর উন্নতি বিধান করে।

এই অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করবো কি প্রকার বিষয়ে বেখেয়াল ব্যক্তিগণ সাধারণভাবে চিন্তা করার প্রবণতা দেখায়। এই বিষয়গুলো বিস্তারিত বলার কারণ, যাতে মানুষ যারা এই বইটি পাঠ করে তারা তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করে, যখন কিছু বিষয় এখানে যা উল্লেখ হয়েছে তার সমতুল্য তাদের মনকে নাড়া দেয়, যখন তারা কাজে যায় বা স্কুলে যায় অথবা নৈমিত্তিকভাবে কোন কিছু করার সময় যা তারা কিছু অকাজের বিষয়

নিয়ে ভাবছে। অতএব তারা তাদের চিন্তা-ভাবনা তাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারতো এবং তাদের জন্য সত্যিকারভাবে উপকারী বিষয়ে চিন্তা করতে পারতো।

অহিতকর দুশ্চিন্তা

যখন একজন তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং শুভ পরিণতি অর্জনের দিকে তাদের পরিচালিত করতে ব্যর্থ হন তখন, তিনি প্রায়ই আশঙ্কা অনুভব করেন অথবা ঘটনা প্রবাহ এমনভাবে বিবেচনা করেন যা ঘটেনি তা যেন এগুলো সংঘটিত হয়েছে এবং দুঃখ, সংকট, দুশ্চিন্তা ও ভয় দ্বারা বিপথে পরিচালিত হয়েছে।

কোন ব্যক্তি যার একজন তরুণ রয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য অধ্যয়নরত, উদাহরণস্বরূপ, কোন নাটক সৃষ্টি করতে পারে পরীক্ষার অনুষ্ঠানের পূর্বে, কি ঘটত যদি এক্ষেত্রে তার সন্তান পরীক্ষায় পাস না করে। "যদি ভবিষ্যতে আমার ছেলে কোন ভাল কাজ না পায় এবং টাকা উপার্জন না করতে পারে, সে বিয়ে করতে সক্ষম হবে না। এমনকি যদি সে বিয়ে করেই ফেলে, কি করে একটা বিবাহের খরচ যোগাতে পারে? যদি সে পরীক্ষায় ফেল করে প্রস্তুতিমূলক কোর্সের জন্য সব টাকা খরচ বা বিনষ্ট হয় এবং তার উপরে লোক চোক্ষে আমাদের সম্মানহানি ঘটবে। যদি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ছেলে পাস করে এবং আমার নিজের ছেলে ফেল করে তখন কি ... ?

এই ভুল বুঝাবুঝিসমূহ চলতেই থাকে। এই ব্যক্তির পুত্র যাহোক এখনও পরীক্ষায় অবতীর্ণই হয় নাই। সারা জীবনব্যাপী কোন ব্যক্তি যদি ধর্ম থেকে অনেক দূরে থাকেন তাকে অকল্যাণজনক দুশ্চিন্তা বাধা দিতে পারে না। এর জন্য নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে যে, লোকজনকে কেন অহেতুক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করা যাবে না, তাহল শয়তানের ফিসফিসানিতে কর্ণপাত করা ঃ

> *(শয়তান) 'অবশ্যই নিশ্চিত যে, আমি তোমাদের বিপথগামী করবো এবং তাদের অন্তরে নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক ঘটাবো।' ... (সূরা নিসা-১১৯)*

উপরের আয়াতে যেমন দেখা যায় যে নিষ্ফল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভুলে যায় এবং স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে পারে না, তারাই সর্বদা শয়তানের ফিসফিসানির নিকট উন্মুক্ত। অন্য কথায়, যদি মানুষ পার্থিব জীবন দ্বারা প্রতারিত হয়ে তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ না করেন এবং বিবেক বুদ্ধিসহকারে কাজ না করে এবং যদি তিনি নিজে ঘটনা প্রবাহের গতিপথে বিচ্যুতি ঘটান, তিনি সম্পূর্ণরূপে শয়তানের নিয়ন্ত্রণে চলে আসেন। শয়তানের আচরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রীতি হল যে, মানুষকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করা। অতএব, সকল ভুল ধারণা, নৈরাশ্যবাদ এবং দুশ্চিন্তা যেমন "যদি এমন ঘটনা ঘটে তবে আমি কি করব", মনে এরূপ ফন্দিফিকির শয়তানের ফিসফিসানিতে ঘটে থাকে।

আল্লাহ মানুষকে পথ প্রদর্শন করেন এরূপ অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য। কোরআনে আল্লাহ মানুষকে উপদেশ দেন, যখন শয়তান থেকে কোন অশুভ

তাড়না উদ্রেক হয়, তখন তাদের আল্লাহর আশ্রয় যাচনা করা উচিত এবং তাঁকে (আল্লাহকে) স্মরণ করা উচিত ঃ

> *'যেহেতু ওই সকল লোকের যাদের অন্তরে খোদাভীতি (তাকওয়া) থাকে, যখন শয়তান তাদের কুমন্ত্রণা দেয় তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তখনই অন্তরচক্ষু খুলে যায়। কিন্তু যেহেতু শয়তানের ভাইয়েরা তাদের ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে এবং তারা তাতে ত্রুটি করে না। (সূরা আল-আরাফ ঃ ২০১-২০২)*

আয়াতটিতে যেমন বিবৃত হয়েছে, কোন ব্যক্তি যিনি গভীরভাবে চিন্তা করেন কোনটি শুভ তা দেখতে পান এবং তাকে শয়তান যেখানে টেনে নিয়ে যেতে চায় সেখানে তিনি যান না।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল তা জানা, যে এই চিন্তাসমূহ ব্যক্তি কোন কাজে আসবে না, পরন্তু সত্য নিয়ে ভাবতে বাধা প্রদান করে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা এবং অতএব মনকে এই অকাজের চিন্তা থেকে পবিত্র করা। মানুষ কেবল যথোচিত চিন্তা করতে পারে যদি তার মনকে অন্তঃস্বারশূন্য চিন্তা থেকে মুক্ত করতে পারে। এভাবে তিনি "যা নিষ্ফল তা থেকে নিজকে দূরে রাখতে পারেন" যেমন আল্লাহ কোরআনে হুকুম জারী করেছেন।

কি কারণসমূহ চিন্তায় বাধা প্রদান করে?

মানুষকে চিন্তা করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন অনেক কারণ রয়েছে। এদের একটিমাত্র অথবা কয়েকটি অথবা এদের সবকটি এক ব্যক্তিকে চিন্তা-ভাবনা করতে এবং সত্যকে দর্শন করা ঠেকিয়ে রাখে। এ বিষয়ে এটাও প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নেতিবাচকভাবে তাদের উপর প্রভাব ফেলে যে কারণসমূহ তা চিহ্নিত করা এবং তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া। অন্যথায় একজন এই পার্থিব জীবনের বাস্তব চেহারা এবং যা পরকালে বিরাট ক্ষয়ক্ষতি আনয়ন করতে পারে তা দেখতে পায় না।

যে সব লোক ভাসা ভাসা চিন্তার প্রতি অভ্যস্ত, তাদের অবস্থা সম্বন্ধে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা আমাদের বলেন ঃ

> *"তারা এই পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকটি জানে কিন্তু পরকাল সম্বন্ধে তারা বেখবর। তারা তাদের অন্তরে কি অনুধ্যান করে নি? আল্লাহ যথাযথভাবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আকাশসমূহ ও এদের মধ্যবর্তী যা কিছু আছে তা সৃষ্টি করেন। তথাপি অনেক লোক তার সাথে সাক্ষাত ঘটার বিষয়টি অগ্রাহ্য করে।" (সূরা রূম ঃ ৭-৮)*

সংখ্যাগরিষ্ঠতা মানসিক অসাড়তা ঘটায় এই সত্য অনুসরণে

মানুষকে বেশির ভাগ পথচ্যুত করার বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল তাদের এই বিশ্বাস যে "সংখ্যাগরিষ্ঠ যাই করুক না কেন তাই সঠিক"। মানুষ চিন্তা ভাবনা দ্বারা সত্যকে খুঁজে পাওয়ার চেয়ে বরং তার চারপাশের লোক যা শেখায় তা গ্রহণ করাতেই ঝোঁক বেশি থাকে। তিনি দেখতে পান প্রথম দৃষ্টিতে যা তার কাছে বিষম মনে হয় তা বেশির ভাগ সময় সাধারণ মানুষের দ্বারা সাধারণ বিবেচিত হয়, এবং তার উপর তা তাদের এমনকি চোখেও পড়েনা এবং কিছুকাল পর তিনিও তাদের প্রতি অভ্যস্ত হতে শুরু করে।

উদাহরণস্বরূপ, এই চক্রের একটি বিরাট অংশের মানুষ স্বীকার করেন না যে একদিন তারা মৃত্যুবরণ করবে। এমনকি তারা এই বিষয়ের উপর কোন ব্যক্তি কথাবার্তা বলুক তা তারা চাননা যাতে মৃত্যু স্মরণ করতে না হয়। তাই দেখে কোন ব্যক্তি তার চারপার্শ্বে তাকিয়ে দেখে এবং বলে "যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি ওটার মত, আমার একই রূপ আচরণের ব্যাপারে কোন দোষ নেই" এবং মৃত্যুর কথা মোটেই স্মরণ করা ছাড়াই জীবন যাপন শুরু করে। যাহোক, যদি তার চারপার্শ্বের লোকেরা আল্লাহ ভীতিসহকারে কাজ করে থাকে এবং পরকালের জন্য সত্যিকার সংগ্রামের সাথে সংগ্রাম করে, খুব সম্ভবত এই ব্যক্তিতার মনোভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে।

আরেকটি উদাহরণ টিভি এবং ম্যাগাজিনে যেমন, বিপর্যয়ের, অসদুপায়, অবিচার, অত্যাচার, আত্মহত্যা, নরহত্যা, চৌর্যবৃত্তি, জোচ্চুরী এর উপর শত শত সংবাদ আইটেম কভার করে এবং হাজার হাজার অভাবগ্রস্থ লোকদের কথা প্রত্যেক দিন উল্লেখ করা হয়। তথাপি বহু লোক যারা সংবাদ আইটেমগুলো পাঠ করে তারা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে যায় অথবা কম প্রসন্নতার সাথে টিভি চ্যানেলের সুইচ ঘুরায়। সাধারণভাবে লোকজন ভাবেন কেন এতগুলো এই প্রকার সংবাদ আইটেম থাকে অথবা কি করতে হবে এবং তাদের থামাতে কি প্রকার পূর্ব সতর্কতা নেয়া যাবে এবং তারা নিজেরাই এই সমস্যাগুলোর ব্যাপারে কি করতে পারে। তাদের চারপার্শ্বের লোকেরা ঐ সমস্যাগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করেনা। বেশির ভাগ লোক এই সমস্যাগুলোর জন্য অন্যদের দায়ী করেন—এই যুক্তি প্রয়োগ করে যে, "পৃথিবীকে বাঁচানো আমারই দায়িত্ব।"

মানসিক শ্রমবিমুখতা

শ্রমবিমুখতা এমন একটি ফেক্টর যা বেশির ভাগ লোককে চিন্তা করা থেকে দূরে রাখে। মানসিক শ্রমবিমুখতার কারণে পৃথিবীতে লোকেরা যে ভাবে সর্বদা দেখেছে সেই পন্থায় প্রত্যেকে কিছু করে এবং এর প্রতি তারা অভ্যস্ত। সাধারণত আমাদের প্রাত্যহিক জীবন থেকে উদাহরণ দেয়া যায়—গৃহিণীরা যেভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে কাজ করে তা ঠিক যেন তাদের মায়েদেরকে যেমন এই কাজ করতে দেখেছেন। সাধারণত তারা ভাবেনা "কিভাবে অধিকতর পরিচ্ছন্নতা ও বাস্তব পন্থায় ব্যাপারগুলো করা যেতে পারে" নয়তবা নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেতে প্রচেষ্টা চালানো যেতে পারে। অনুরূপভাবে যখন কোন মেরামত করার প্রয়োজন হয়, মানুষ তার শৈশবকাল থেকে শেখানো পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে। তারা সাধারণত এর নতুন পদ্ধতি যা অধিকতর বাস্তবসম্মত ও উপযুক্ত তা ব্যবহার করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। এরূপ লোকদের কথা বলার ধরনও একই রকম। উদাহরণস্বরূপ একজন হিসাবরক্ষক তার জীবনে অন্যান্য হিসাবরক্ষকদের যেমনভাবে কথা বলতে দেখেছেন তেমনভাবে তিনি কথা বলেন। ডাক্তার, ব্যাংকার, বিক্রেতাগণ ... প্রত্যেক শ্রেণীর লোকের বিশিষ্ট ধরনের কথা বলার ষ্টাইল থাকে। তারা সবচেয়ে যা বেশি যথোচিত, সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে অনুকূল পদ্ধতি এ সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখতে চায় না। তারা যা শুনেছে ঠিক তাই অনুকরণ করে।

সমস্যাগুলির পাওয়া সমাধানগুলোও চিন্তা করার ক্ষেত্রে মানসিক শ্রমবিমুখতা প্রতিফলিত করে। উদাহরণস্বরূপ একটি অট্টালিকার ব্যাবস্থাপক, বিল্ডিং ও জঞ্জাল আবর্জনা সমস্যার ব্যাপারটি ঠিক যেমন পূর্ববর্তী ব্যাবস্থাপকগণ যেসব সমাধান আনয়ন করেছেন তেমনি আনেন। অথবা একজন মেয়র আগেকার মেয়রগণ যেভাবে ট্রাফিক সমস্যার সমাধান করেছেন তা দেখে সমস্যার সমাধান করেন। বহু ক্ষেত্রে চিন্তা না করার কারণে তিনি নতুন একটি সমাধান খুঁজে বের করতে পারেন না।

যেসব উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা নিশ্চিতভাবেই এমন বিষয়সমূহ যা জনসাধারণ প্রাত্যহিক জীবনে যা থেকে দূর্ভোগ পোহায়। তবুও ঐগুলোর চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, যদি লোকেরা এই সম্বন্ধে চিন্তা করতে ব্যর্থ হয় তবে তাদের বিরাট দুর্ভোগ এবং চিরন্তন ক্ষতির কারণ ঘটাতে পারে। এই ক্ষতির কারণ হল একজন তাদের এই পৃথিবীতে অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে ব্যর্থতা, এই মৃত্যু যে অনিবার্য এই বিশ্বাস এবং আমরা নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর পর হিসাব-নিকাশের দিনের মুখোমুখি হব, তা অগ্রাহ্য করা। কোরআনে আল্লাহ এই সংকটপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর অনুধ্যান করতে আহ্বান করেছেন।

"ওরা ঐ লোক যারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করেছে। যেসব অলীক উপাস্য সাব্যস্থ করেছিল তা তাদেরকে পরিত্যাগ করেছে। প্রশ্নাতীতভাবে তারা পরকালে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা বিশ্বাস করে এবং নেক কাজ করে তাদের প্রভুর সম্মুখে বিনয়ের সাথে নিজেদের উপস্থাপন করে তারাই জান্নাতের অধিকারী অসীম সময়ের জন্য চিরকাল। দল দুটির উদাহরণ হচ্ছে যেমন এক ব্যক্তি অন্ধ ও বধির এবং অপর ব্যক্তি চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। তারা কি পরস্পর একই রকম। অতএব তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সূরা হুদ ২১-২৪)

"তবে কি যিনি সৃজন করেন তিনি তার মতই যে সৃজন করেনা? সুতরাং তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?" (সূরা নাহল-১৭)

"অতি বেশি চিন্তা ভাল নয়" শর্তযুক্ত সাড়া

সমাজে একটি দৃঢ় বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে গভীর চিন্তা করা মঙ্গলজনক নয়। লোকেরা একজন অন্যজনকে এই বলে সতর্ক করেন "খুব বেশি চিন্তা করোনা, তুমি তোমার মন হারিয়ে ফেলবে।" নিশ্চয়ই যারা ধর্ম থেকে দূরে থাকে এটাই লোকদের আবিষ্কৃত কুসংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। মানুষ চিন্তাকে এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু নেতিবাচকভাবে চিন্তা করা অথবা অতিরঞ্জিত সন্দেহ এবং বিভ্রান্তিতে ভেসে যাওয়া নয়।

যেহেতু ঐসব লোক যাদের আল্লাহ ও তাদের পরকালের প্রতি জোরদার বিশ্বাস নেই, সততার প্রতি তাদের নিজেদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া ছাড়াই চিন্তা করে, কিন্তু নেতিবাচকভাবে সত্ত্বেও, তারপর তারা ধ্যান দ্বারা যে ফলাফল অর্জন করে তা সম্পূর্ণরূপে উপকারী নয়। উদাহরণস্বরূপ তারা ভাবে, এই পার্থিব জীবন অস্থায়ী, এবং একদিন তারা মৃত্যুবরণ করবে কিন্তু তা তাদেরকে নিরাশা প্রদর্শন করার বিরাট কারণ ঘটায়। এটা এই কারণে যে, সচেতনভাবে তারা অবগত যে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া যে জীবন যাপন করে পরকালে তাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির প্রস্তুতি ঘটায়। অপরপক্ষে, কেহ কেহ আশাবাদী, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তারা মৃত্যুর পর সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যাবে।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি আল্লাহ এবং পরকাল বিশ্বাস করেন তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন উপসংহার টানেন যখন তিনি এই সত্য অনুধ্যান করেন যে পৃথিবী অস্থায়ী। সর্বপ্রথম, পৃথিবী যে অস্থায়ী এই উপলব্ধি পরকালে তার বাস্তব ও অনন্ত জীবনের জন্য তাকে ঈর্ষাপূর্ণ সংগ্রামে লিপ্ত করায়। যেহেতু তিনি জানেন যে এই জীবন আগে হোক পরে হোক শেষ হয়ে যাবে তিনি পার্থিব আবেগ ও স্বার্থের জন্য উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হননা। তিনি চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পিত। এই অস্থায়ী জীবনের কোন কিছুই তাকে বিব্রত করে না। তিনি সর্বদা অনন্ত ও আরামের জীবনের জন্য আশা পোষণ করেন। তিনি পার্থিব আশীর্বাদ ও সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন ও খুব বেশি। আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষার জন্য এই পৃথিবী অসম্পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন এবং ত্রুটিযুক্ত করেছেন। বুদ্ধিমান মানুষ মনে করে যে এই অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিযুক্ত পৃথিবীতে যদি এত সৌন্দর্য্য যা মানুষকে আনন্দ দেয়, তাহলে বেহেশতের সৌন্দর্য কল্পনাতীতভাবে আরও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি পরকালে এখানকার প্রত্যেক সৌন্দর্য্যের 'আসল' রূপ দেখতে আশা করেন।

অতএব "শেষে সত্যকে দেখে যদি আমি আশাবাদী হই তাহলে" এই সম্বন্ধে দুঃখ করা এবং তাই চিন্তাকে এড়িয়ে যাওয়া বিরাট ক্ষতি হবে। একজন ব্যক্তি যিনি সর্বদা আল্লাহতে বিশ্বাস গুণ দ্বারা আশা পোষণ করেন এবং যিনি ইতিবাচক চিন্তা করে, কোন কিছুই নৈরাজ্যের দিকে পরিচালিত করে না।

চিন্তা আনয়ন করে এরকম দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া

অধিকাংশ মানুষ মনে করে যে চিন্তাকে এড়িয়ে গিয়ে ও তাদের মস্তিষ্ককে নির্দিষ্ট কাজে নিবদ্ধ করে বিভিন্ন দায়িত্ব কৌশলে পরিহার করতে পারত। পৃথিবীতে এরূপ কাজ করে তারা বহু বিষয় থেকে তাদেরকে দূরে রাখতে সফল হয়। মানুষ যাতে প্রতারিত হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পন্থা হল তাদের এরূপ অনুমান যে চিন্তা-ভাবনা না করে তারা তাদের প্রভুর প্রতি দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যেতে পারে। মানুষ মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জীবন সম্পর্কে কেন চিন্তা করে না এটিই প্রধান কারণ। যদি মানুষ চিন্তা করে যে সে একদিন মারা যাবে এবং স্মরণ করে যে মৃত্যুর পর এক অনন্ত জীবন আছে, তাহলে মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য উদ্যাম অধ্যবসায়ের সাথে কঠোরভাবে চেষ্টা করত। সে যাহোক, নিজেকে প্রতারিত করে, এরূপ মনে করে যে এরূপ দায়িত্ব থেকে সে মুক্ত, যেহেতু সে পরকালের অস্তিত্ব সম্পর্কে সে ভাবে না। এটি বড় ধরনের আত্ম-প্রতারণা, যদি সে চিন্তা দ্বারা এই পৃথিবীতে সত্যকে লাভ না করে, সে বুঝবে, মৃত্যুর সাথে সাথে তার জন্য কোন পালিয়ে যাবার উপায় নেই।

"মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই উপস্থিত হবে, তাই এটি হতে তুমি অব্যাহতি চাইতে এবং ফুৎকার শিংগায় দেয়া হবে। এটিই ভয়ঙ্কর দিন।" *(সূরা কাহাফ : ১৯-২০)*

প্রাত্যহিক জীবন প্রবাহে ভেসে যাবার কারণে চিন্তা না করা

বেশির ভাগ লোক ছুটাছুটির মাধ্যমে তাদের জীবন কাটিয়ে দেয়। যখন তারা নির্দিষ্ট বয়সে পৌছে, তাদের কাজ করতে হয় এবং তাদের নিজেদের এবং পরিবারের প্রতি খেয়াল রাখতে হয়। তারা একে "জীবন-সংগ্রাম" বলে এবং অভিযোগ করে যে তাদের কোন সময় নেই, কারণ এই সংগ্রামের পিছনে ছুটাছুটি করতে হয়। এই তথাকথিত "সময়ের স্বল্পতায়", চিন্তা ঐ জিনিসগুলোর একটি যার জন্য তারা সময় দিতে পারেন না। অতএব, তারা ভেসে চলে যেখানে তাদের দৈনন্দিন জীবন বয়ে নিয়ে যায়। জীবনের এই পথে, তাদের চারদিকের ঘটনাবলির প্রতি তারা অসচেতন থাকেন।

যাহোক মানুষের উচিত নয় সময়কে গ্রাস করা, একস্থল থেকে অন্যস্থানে ধেয়ে চলা। প্রধান বিষয় হবে এই পৃথিবীর প্রকৃত মুখচ্ছবি দেখতে সক্ষম হওয়া এবং তদনুসারে জীবনের চলার পথ গ্রহণ করা। উপার্জন, কাজে যাওয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা, অথবা একটি বাড়ি কেনা কারও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নিশ্চয়ই মানুষ তার জীবন চলার পথে এগুলো করার প্রয়োজন হয় তথাপি এগুলো করার আগে একটি বিষয় যা সর্বদা তার মনে রাখা উচিত ঃ এই পৃথিবীতে তার বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দাস হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর দয়া ও বেহেশতের জন্য কাজ করা। এই উদ্দেশ্য ছাড়া সকল কাজ তার সত্যিকার উদ্দেশ্য হাসিলের "উপায়" হিসাবে সাহায্য করবে। বাস্তব উদ্দেশ্য হিসাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপায় গ্রহণ করা হল একটি ভয়ানক প্রতারণাযার দ্বারা শয়তান মানুষকে বিপথে চালায়।

কোন কোন ব্যক্তি যারা চিন্তা-ভাবনা ছাড়া বেঁচে থাকে, প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসাবে এই উপায় সহজেই গ্রহণ করতে পারে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে তার একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে পারি। এটি নিঃসন্দেহে একজনে কাজ করা এবং সমাজের জন্য কল্যাণকর জিনিস উৎপাদন করা একটি ভাল কাজ। একজন ব্যক্তি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে এরূপ কাজ আগ্রহসহকারে সম্পাদন করে এবং ইহকাল ও পরকালে আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কার প্রত্যাশা করে। অপরপক্ষে, যদি একজন ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ না করে একই কাজ করে এবং কেবলমাত্র পার্থিব স্বার্থে যেমন পদমর্যাদা ও মানুষের মূল্যায়নের জন্য করে তবে তিনি একটি ভুল করছেন। তিনি একটা কিছু তৈরি করেছেন যা দ্বারা আল্লাহর খুশি ও তার উদ্দেশ্য হাসিলের উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। এবং তিনি যখন পরকালের বাস্তবতার সম্মুখীন হবেন তার জন্য তখন দুঃখ প্রকাশ করবেন। যারা পার্থিব জীবনে এইভাবে নিমগ্ন থাকে, তাদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ একটি আয়াতে বলেন যা নিম্নরূপ–

> *"তোমাদের পূর্বপুরুষদের ন্যায় ছিল তারা তোমাদের অপেক্ষা বহুগুণে ক্ষমতাবান এবং ধন ও সন্তান ছিল তাদের অধিক; এবং তাদের ভাগ্যে যা ছিল*

তারা উপভোগ করেছে, ভাগ্যে তোমাদের যা ছিল তাও তোমরা উপভোগ করলে যেমনটি ভোগ করেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীরা, ওরা যেমন বেহুদা আলাপ করত, তোমরাও সেরূপ আলাপ করেছ ওদেরই কর্ম ইহ-পরলোকে ব্যর্থ হয়েছে- ওরাই ক্ষতিগ্রস্থ।" (সূরা তাওবাহ ঃ ৬৯)

"অভ্যাসের চোখ দ্বারা" প্রত্যেক বস্তুর দিকে তাকানো এবং অতএব তাদের উপর অনুধ্যান করতে প্রয়োজন নেই তা দেখা

যখন মানুষ প্রথমবারের জন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তুর সম্মুখীন হয়, তারা তাদের অসাধারণ প্রকৃতি বুঝতে পারে এবং যা দেখে তা আরও পরিদর্শন করতে তাদের তাড়িত করতে পারে। কিছুক্ষণ পর, যাহোক তারা এদের প্রতি একটি স্বভাবগত নিস্পৃহভাব জন্মায় এবং এগুলি আর তাদের অভিভূত করে না। বিশেষ করে, একটি বস্তু বা ঘটনা যা তারা প্রতিদিন সাক্ষাৎ পায় তা তাদের জন্য "সাধারণ" হয়ে যায়।

উদাহরণস্বরূপ, সম্ভাবনাশীল ডাক্তারগণ প্রথমবারের মত যখন একটি শবদেহ দেখেন অথবা প্রথমবারের মত তাদের একজন রোগী যখন মারা যান, এটা তাদের গভীরভাবে ভাবনার উদ্রেক ঘটায়। এতে তাদের বিরাট অনুভূতিগত প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এটা হতে পারে যে অকস্মাৎ তারা প্রাণহীন একজন ব্যক্তির প্রায় নিরেট দেহের সম্মুখীন হন, যিনি মাত্র কয়েক মিনিট আগে, পরিপূর্ণ প্রাণবন্ত, হাসছেন, পরিকল্পনা নির্মাণ করছে, আলাপ করছেন, আনন্দ লাভ করছেন, জীবন্ত চোখ জ্বল জ্বল করছিল। প্রথমবারের মত তাদের সামনে একটি শবদেহ ময়না তদন্তের জন্য রাখা হলে, তারা এবং ঐ শবদেহে যা দেখেন তার প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর চিন্তা করেন ঃ যে দেহটা এত দ্রুত ক্ষয় হয়, যে একটি বিস্বাদ গন্ধ তা থেকে বেড়িয়ে আসে, যে চুলগুলো একদিন দেখতে এত মনোরম ছিল তা এমন অসুন্দর হবে যা একজন স্পর্শ করতে চায়না, সকল বিষয় সম্বন্ধে তারা চিন্তা করে। ঐগুলোর পর তারা ভাবে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের গঠন উপাদান একই এবং প্রত্যেকেই একই পরিণতি লাভ করবে, অর্থাৎ তারাও এর মতই হবে।

তথাপি, কিছু শবদেহ দেখার পর অথবা কিছু রোগী হারিয়ে, এই লোকগুলোর মধ্যে নির্দিষ্ট জিনিসের প্রতি স্বভাবগতভাবে নিস্পৃহভাব জন্ম নেয়। তারা এমনকি রোগীদের প্রতি এমন আচরণ করে যে যেন তারা বস্তু।

নিশ্চয়ই, এরূপ অবস্থা কেবল ডাক্তারদের বেলায় ঘটেনা। অধিকাংশ লোকের জন্য তাদের জীবনের বহু ক্ষেত্রে একই অবস্থা প্রযোজ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন একজন ব্যক্তি যিনি অসুবিধার মধ্যে জীবন যাপন করেন তাকে যদি আনন্দময় জীবন দান করা হয়, তিনি বুঝতে পারেন তিনি যা পেয়েছেন তা তার জন্য আশীর্বাদ। যে তার বিছানা

আরও আরামদায়ক, তার বাড়ির একটি মনোরম দৃশ্য আছে, তিনি যা কিছু চান তা কিনতে পারেন, তিনি শীতকালে যেমন চান তেমন তার বাড়ী গরম করতে পারেন, তিনি সহজেই গাড়ি দ্বারা চলাচল করতে পারেন এবং অন্যান্য বহুরকম বস্তু যা তার জন্য আশীর্বাদ। তার পূর্বের অবস্তার কথা ভেবে, এই প্রত্যেকটির ব্যাপারে তিনি উল্লাস করেন। তথাপি যে ব্যক্তি জন্মগতভাবে এই সবের মালিক, তারা এদের সম্পর্কে এত বেশি ভাবনা নাও করতে পারেন। অতএব তাদের এই আশির্বাদের মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না, যদি না এদের উপর না ভাবেন।

অপরপক্ষে একজন ব্যক্তি যিনি ভাবেন, তিনি এই আশীর্বাদ জন্ম থেকে পেয়ে থাকেন অথবা পরে অর্জন করেছেন, তা তাতে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করেন। তিনি তার অধিকৃত বস্তুর উপর কখনও স্বভাবগতভাবে তাকান না। তিনি জানেন যে, যার তিনি মালিক, তা আল্লাহ দ্বারা সৃষ্ট এবং আল্লাহ এগুলো তাদের থেকে ফিরিয়ে নিতে পারেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। উদাহরণস্বরূপ মোমেনগণ নিম্নলিখিত প্রার্থনা অনুসরণ করেন যখন তারা তাদের আরোহণের পশু অর্থাৎ বাহনে চড়েন ঃ

> *"যাতে তোমরা এদের পৃষ্ঠে স্থির বসে রবের দানকে স্মরণ কর এবং বল তিনি পবিত্র যিনি আমাদের অসমর্থ সত্ত্বেও এদেরকে বশীভূত করেছেন আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করব।" (সূরা যুখরুফ ঃ ১৩-১৪)*

অন্য আয়াতে বলা হয় যখন মোমেনগণ জান্নাতে প্রবেশ করে, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং বলে *"আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই ..... (সূরা কাহফঃ ৩৯)* যখন তারা তাদের বাগানে প্রবেশ করে, তারা ভাবে আল্লাহ একে সৃষ্টি করেছেন—আল্লাহ একে টিকিয়ে রাখেন। অপরপক্ষে এক ব্যক্তি যিনি চিন্তা করেন না, তিনি প্রথমবারের মত একটি মনোরম বাগান দেখে অভিভূত হন কিন্তু তারপর এটা তার জন্য একটি সাধারণ স্থান হয়ে যায়। তাতে যে সৌন্দর্য আছে তার জন্য প্রশংসা ম্লান হয়ে যায়। কোন কোন ব্যক্তি এই আশীর্বাদসমূহ মোটেই উপলব্ধি করেন না যেহেতু তারা চিন্তা করে না তারা এই আশীর্বাদকে 'সচরাচর' মনে করে এবং 'তা এমন কিছু যা এমন ছিলই'। অতএব, তারা তাদের সৌন্দর্য্য থেকে কোন আনন্দ পায়না।

উপসংহার ঃ যে কারণসমূহ চিন্তা-ভাবনা থেকে সকলকে পশ্চাদগামী করায় তা নির্মূল করা মানুষের জন্য অবশ্য পালনীয়

আগে যেমন আমরা বলেছিলাম যে বেশির ভাগ লোকই চিন্তা করেনা এবং সত্যকে অগ্রাহ্য করে জীবনযাপন করে, তা চিন্তা না করার জন্য যথেষ্ট অজুহাত হতে পারে না। প্রত্যেক লোক এরূপ স্বাধীন ব্যক্তি যিনি নিজেই আল্লাহর নিকট নিজেই দায়ী। এটা

স্মরণে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আল্লাহ এই পৃথিবীর জীবনে মানুষকে পরীক্ষা করেন। অন্যদের উদাসীনতা, তারা এমন লোক যারা চিন্তা করে না, যুক্তি বিতর্ক করেন এবং সত্যকে দেখতে পায়না, তারাই বেশির সময় এই পরীক্ষার আওতায়। একজন ব্যক্তি যে আন্তরিকভাবে চিন্তা করেন তিনি বলেন না যে, "অধিকাংশ লোক চিন্তা করে না, এ সম্বন্ধে অনবহিত, এবং অতএব আমার কেন একা চিন্তা করা উচিত?" পরন্তু, তিনি চিন্তা দ্বারা এই লোকগুলির অমনযোগীতা থেকে সতর্কতা গ্রহণ করেন এবং তাদের একজন না হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করেন। এটা পরিষ্কার যে লোকদের অবস্থা তার জন্য অজুহাত হতে পারে না। কোরআনে আল্লাহ তার অনেক আয়াতে আমাদের জানান যে বেশির ভাগ লোকই অমনযোগী এবং তারা বিশ্বাস করেনা ঃ

যতই তুমি কামনা করনা কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়।

(সূরা ইউসুফ ঃ ১০৩)

আলিফ-লাম-মীম রা; এগুলো কিতাবের আয়াত, যা তোমার রব হতে তোমার প্রতি নাজিল হয়েছে তা সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক ঈমান আনেনা।

(সূরা রা'আদ ১)

আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে কসম করে বলে ঃ যে ব্যক্তি মারা যায় আল্লাহ তাকে পুনরায় জীবিত করবেন না। অবশ্যই করবেন, এ ওয়াদাতো আল্লাহ নিজের উপর অবশ্য পালনীয় করে রেখেছেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না। (সূরা নাহল ঃ ৩৮)

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দেন যে যারা মেজরিটিকে অনুসরণ করে বিপথে চলে, তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয়।

"যারা বিপথে চলে গেলেন তারা আল্লাহর আদেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এবং আমি সে পানি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেই যাতে তারা ভেবে দেখে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করে না। (সূরা ফোরকান ঃ ৫০)

"তারা সেথায় আর্ত চীৎকার করে বলবে ঃ হে আমাদের রব! আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন, আমরা নেক কাজ করব যা পূর্বে করতাম তা করব না।

আল্লাহ বলবেন ঃ আমি কি তোমাদের এতটা আয়ু দেই নি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত, তাছাড়া তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল। অতএব শাস্তি আস্বাদন কর। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

এই কারণে চিন্তা করতে বাধা দানের যুক্তি হতে অব্যাহতি লাভ করে প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত আল্লাহ যে প্রত্যেক ঘটনা ও জীব সৃষ্টি করেছেন তার উপর আন্তরিক ও সৎভাবে চিন্তা করা এবং এই চিন্তা থেকে শিক্ষা ও সতর্কতা গ্রহণ করা।

পরবর্তী অধ্যায়ে মানুষ যে প্রাত্যহিক জীবনে নির্দিষ্ট ঘটনা ও সৃষ্টির সম্মুকীন হয় তার উপর কি চিন্তা করে তার উপর আলোচনা করব।

আমাদের উদ্দেশ্য এই বিষয়গুলো এই বইয়ের পাঠকের পথ নির্দেশনা দেবে এবং তাদেরকে ঐ লোকদের ন্যায় বাকী জীবন কাটাতে সাহায্য করবে– "যারা যা অঅনুধ্যান করে তা থেকে চিন্তা করে ও সতর্কতা গ্রহণ করে।"

যে সব বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন

বইটির শুরু থেকে আমরা চিন্তার গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেছিলাম ঃ মানুষের জন্য যা লাভ বয়ে আনে এবং চিন্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি যা মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে পৃথক করে। আমরা আরও উল্লেখ করেছিলাম যে কারণসমূহ চিন্তা করতে বাধা দান করে। এসবের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে চিন্তা করতে উৎসাহ যোগানো এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্য দেখতে সহায়তা করা এবং আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও শক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করতে।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় একজন আল্লাহ বিশ্বাসী ব্যক্তি দিনের বেলা যা কিছুর দেখা পায় তার সম্বন্ধে কি ভাবে, যে ঘটনাগুলি প্রত্যক্ষ করে তা থেকে কি শিক্ষা পায়, প্রত্যেক বস্তুতে তার প্রভুর আর্ট ও জ্ঞান দেখে কিভাবে আল্লাহর শুকুর করে ও তার সন্নিধ্যানে আসে, আমরা তার বর্ণনা করার চেষ্টা করব।

নিশ্চয়ই এখানে যা উল্লেখ করা হবে তা মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতার সামান্য অংশই কভার করে। মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে (ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড নয়-মুহূর্ত) চিন্তা করতে সক্ষম। মানুষের চিন্তার পরিধি এত বিশাল যে, এর উপর বাধা বা সীমারেখা টানা প্রায় অসম্ভব। নিচে যা কিছু বলা হবে তার উদ্দেশ্য হল—যে সব লোক চিন্তা করার ক্ষমতাকে কাজে লাগায় না তাদের জন্য একটি যুক্তিযুক্ত দরজা খুলে দেয়া।

মনে রাখা উচিত, যে সব লোক অনুধ্যান করতে পারে, তারা বুঝে এবং অন্যদের থেকে ভিন্ন অবস্থান ধারণ করে। যারা চারপাশের বিস্ময়কর ঘটনাসমূহ দেখতে পায়না এবং অনুধ্যান করতে পারে না তাদের অবস্থা আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

> *যারা কুফুরী করে তাদের উদাহরণ এমন, যেন কোন ব্যক্তি এমন কিছুকে ডাকে যা কোন কিছুই শোনেনা হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া বধির, মূক, অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বুঝবে না। (সূরা বাকারা ঃ ১৭১)*
>
> *... তাদের অন্তর আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে তারা বোঝেনা, তাদের চোখ আছে তা দিয়ে তারা দেখেনা এবং তাদের কান আছে তা দিয়ে শোনেনা। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তারা তার চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই গাফেল উদাসীন। (সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৯)*
>
> *অথবা আপনি কি মনে করেন যে তাদের অধিকাংশই শোনে বা বুঝে? তারাতো নিছক চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তারা আরও অধিক অধম। (সূরা ফুরকান ঃ ৪৪)*

যারা আল্লাহর নিদর্শন, যে জীব ও ঘটনা তিনি সৃষ্টি করেন দেখতে সক্ষম এবং যারা বুঝতে পারে,এরা সেই লোক যারা অনুধ্যান করে।

সকাল বেলা যখন একজন জেগে ওঠে ...

কোন একজনকে চিন্তা শুরু করার জন্য বিশেষ অবস্থার দরকার পড়ে না। সকালে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার মুহূর্ত থেকে আমাদের সামনে চিন্তা করার বিপুল সুযোগ এসে যায়। যখন আমরা ঘুম থেকে জাগি তখন একটি দীর্ঘদিন আমাদের সামনে আসে। বেশির ভাগ সময় যখন আমরা ক্লান্তিবোধ করিনা বা নিদ্রাহীন থাকি, আমরা প্রত্যেকটি বিষয় আবার শুরু করতে প্রস্তুত হই। এই চিন্তা করে একজন আল্লাহর একটি আয়াত স্মরণ করে ঃ

আর তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে করেছেন আবরণস্বরূপ এবং বিশ্রামের জন্য করেছেন নিদ্রা, আর দিনকে করেছেন জাগ্রত থাকার জন্য।

(সূরা ফুরকান ঃ ৪৭)

মুখ ধুয়ে এবং গোসল করে আমরা আমাদেরকে সতেজ করি এবং সম্পূর্ণভাবে আমরা সচেতন হই। এখন আমরা অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ভাবতে প্রস্তুত আছি। আমরা সকাল বেলা কি নাস্তা করব অথবা কোন সময়ে আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাব তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে এবং এগুলো সম্বন্ধে সর্বপ্রথম চিন্তা করতে হয়।

সর্বাগ্রে আমাদের সকাল বেলার জাগ্রত হওয়ার বিষয়টি বিরাট বিস্ময়কর। সম্পূর্ণভাবে আমরা চৈতন্য হারানোর পরও সকাল বেলা চেতনা ও শক্তি ফিরে পাই। হৃদপিণ্ড ধুক্‌ধুক্ করে, আমরা শ্বাস নিতে, কথা বলতে ও দেখতে সক্ষম হই। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যখন নিদ্রা যাই আমাদের নিকট এই আনুকূল্য আবার ফিরে আসবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। আমরা যেখানে থাকি আমরা রাত্রিকালে কোন বিপর্যয়ের সম্মুখীনও হই নাই এবং আমরা প্রাণ হারাতে পারতাম।

উদাহরণস্বরূপ, একজন প্রতিবেশীর অন্য মনস্কতা রাত্রিকালে গ্যাস নির্গমনের কারণ হতে পারত এবং একটি বিরাট বিস্ফোরণ আমাদেরকে জাগিয়ে তুলতে পারত। যে এলাকায় আমরা বাস করি সেখানে একটি ধ্বংসলীলা তা ঘটতে পারত এবং আমরা আমাদের প্রাণ হারাতাম।

আমাদের শারীরিক অন্য কোন সমস্যায় পড়তে পারতাম, উদাহরণস্বরূপ, আমরা আমাদের কিডনীতে প্রচন্ড ব্যাথা নিয়ে অথবা মাথা ব্যাথা নিয়ে জেগে ওঠতে পারতাম। অথচ এসবের কিছুই ঘটেনি এবং আমরা নিরাপদ ও সুস্থভাবে জেগে উঠলাম। এগুলো চিন্তা করে আমরা আল্লাহকে তার দয়া, নিরাপত্তা প্রদানের জন্য শুকুর করতে পারি। সুস্থদেহে আবার একটি দিন শুরু করার অর্থ হল আল্লাহ আমাদের পরকালের জন্য আরও কিছু অর্জন করতে সুযোগ দান করেছেন।

অতএব, সর্বোত্তম মনোভাব আমাদের নিতে হবে যে, আমরা দিনটি এমনভাবে কাটাবো যাতে আল্লাহ খুশী হন। অন্যান্য কিছুর অগ্রাধিকার না দিয়ে, মানুষের এ জন্য পরিকল্পনা নেয়া এবং এরূপ ধরনের চিন্তা দ্বারা তার মনকে ভরপুর রাখা

উচিত। আল্লাহকে খুশী করার প্রারম্ভিক বিষয় হল ... এ ব্যাপারে সাহায্যের জন্য তার নিকট নিবেদন করা। সুলায়মান নবীর প্রার্থনাই বিশ্বাসীগণের জন্য একটি ভাল উদাহরণ রাখে ঃ

> ... *"হে আমার রব। আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার সে সব নিয়ামতের শোকর আদায় করতে পারি যা আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন এবং যেন আমি নেক কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হোন, আর আমাকে নিজ অনুগ্রহে নেক বান্দাদের শামিল করে নিন।*
>
> *(সূরা নামল ঃ ১৯)*

আমাদের কি কি দুর্বলতা যা আমাদের চিন্তার উদ্রেক ঘটায়

আমাদের শয্যা ত্যাগের সাথে সাথেই যখন আমরা দুর্বলতা সমূহের কথা উপলব্ধি করি তখনই আমরা চিন্তা করতে শুরু করি। প্রতিদিন সকালে অবশ্যই আমরা মুখ ধুই ও দাঁত ব্রাশ করি। এরূপ দেখে আমরা অন্যদের দুর্বলতার বিষয়টি চিন্তা করতে শুরু করি। উদাহরণস্বরূপ আমাদের প্রতিদিন গোসল করতে হয়, আমাদের চামড়ার নিচের দিকে একটি ভয়ানক দৃশ্য আছে, রোগ সংক্রমণের জন্য আমাদের দেহ উন্মুক্ত, অনিদ্রা, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা সহ্য করতে পারি না। এগুলোই হল আমাদের দুর্বলতা। সকাল বেলা আয়নায় তাকিয়ে থাকা লোকটি যদি বয়স্ক হয়, অন্যান্য চিন্তা তার মনে আসতে পারে। জীবনের দুই যুগের পরে তার মুখে বয়স হওয়ার প্রাথমিক চিহ্ন আবির্ভূত হয়। ত্রিশ বছর বয়সে চোখের নিচে ও মুখের চারদিকে কুঞ্চন দেখা দিতে শুরু করে এবং চামড়া আর আগের মত লালাভ থাকেনা এবং দেহের বহু অংশে অবক্ষয় দেখতে পাওয়া যায়। বয়স হওয়ার সাথে সাথে চুল সাদা হয়ে যায়, এমনকি হাতগুলোতে বয়সের ছাপ পড়ে।

> *আল্লাহ তিনিই, যিনি তোমাদেরকে দূর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, পরে শক্তি প্রদান করেন, শক্তির পরে আবার প্রদান করেন দূর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি স্বীয় ইচ্ছামত সৃষ্টি করেন, তিনি মহাজ্ঞানী, শক্তিধর।*
>
> *(সূরা রূম ঃ ৫৪)*

এগুলো যিনি চিন্তা করেন বৃদ্ধ বয়সই সবচেয়ে শক্তিশালী

বিষয়সমূহের একটি, যা এই পৃথিবীতে জীবনের অস্থায়ীত্বের বিষয় প্রদর্শন করে এবং কাউকে এই পৃথিবীতে লোভকাতরতায় জড়িয়ে থাকতে বিরত রাখে। যিনি বৃদ্ধ হতে শুরু করেন তিনি বুঝতে পারেন এই পার্থিব জীবনের সময় গণনা শুরু হয়েছে। সত্যিকার অর্থে যা বুড়িয়ে যায় এবং যার জন্য নিম্ন গণনা চলছে তা হল শরীর। দেহ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয় কিন্তু আত্মা বৃদ্ধ হয় না। বেশির ভাগ লোক তাদের যৌবনে সুন্দর হওয়ার বা অসুন্দর বিষয়টি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবান্বিত হন। সাধারণভাবে যারা দেখতে সুন্দর তারা প্রায়ই গোয়ার হয়ে থাকে, যেখানে অনাকর্ষণীয় লোকেরা নিজেদেরকে হীন ও অসুখী মনে করে। বয়স্ক হওয়া, দেহের সৌন্দর্য ও কদর্যতা কত অস্থায়ী, তা দেখায়, আর একমাত্র বিষয় হল যা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য এবং মানুষের জন্য একমাত্র লাভ তা হল সঠিক কাজকর্ম, আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার সমেত চরিত্রের ভাল গুণসমূহ।

প্রত্যেক সময়ে যখন আমরা দুর্বলতার সম্মুখীন হই, আমরা উপলব্ধি করি যে, একমাত্র যা পূর্ণতা প্রাপ্ত এবং সর্বোত্তম-অপরিপূর্ণতার উর্ধ্বে তিনি হলেন আল্লাহ এবং তখনই আমরা আল্লাহর বড়ত্বের মহিমা কীর্তন করি। মানুষের প্রতিটি দুর্বলতা একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। এই উদ্দেশ্য গুলোর কতগুলো মানুষকে এই পার্থিব জীবনে জড়িয়ে না পড়তে সহায়তা করে এবং এগুলো নিয়ে তারা ভুল পথে যায় না। কোন মানুষ যদি এগুলো চিন্তা-ভাবনা দ্বারা বুঝতে পারে, পরকালের জীবনে এই সব দুর্বলতা হতে মুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করতে আল্লাহর কাছে যাচনা করে।

আমাদের দুর্বলতা আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেখানে একটি গোলাপ কালো মাটিতে জন্ম নিয়ে পূর্ণভাবে সুগন্ধ ছড়ায়, যখন আমরা আমাদের যত্ন নেই না তখন এক অসহনীয় গন্ধ আমাদের থেকে বেরিয়ে আসে। এই সামান্য জিনিস সম্বন্ধে একজন গোঁয়ার বিশেষভাবে আত্মাভিমানী লোককে ভাবতে হবে এবং যা থেকে তারা সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে।

মানবদেহের কোন্ কোন্ গঠন বৈশিষ্ট্য মানুষকে চিন্তার উদ্রেক ঘটায়

সকাল বেলা আয়নার দিকে তাকিয়ে আমরা ইতিপূর্বে ভাবি নাই এমন অনেক বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি। উদাহরস্বরূপ আমাদের চোখের লোম, ভ্রুঁ, হাড় এবং দাঁত নির্দিষ্ট দীর্ঘ হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার পর থেমে যায়। অবশ্য চুলের বৃদ্ধি থেমে যায় না। অন্য কথায় যেখানে ঐ সব দেহাংশ যাদের বৃদ্ধি অসুবিধাজনক এবং অলক্ষ্যে বৃদ্ধি থেমে যায়, চুলের বর্ধন যা নান্দনিকভাবে রমনীয় তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া হাড়ের বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এরূপ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সমতাও থাকে। উদাহরণস্বরূপ মানুষের উর্ধাঙ্গের হাঁড়গুলো তুলনামূলকভাবে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেয়ে দেহকে কম আয়তন বিশিষ্ট করে না। এদের বৃদ্ধি ঠিক সময়ে থেমে যায় যেন প্রত্যেকে জানে কত লম্বা ও বৃদ্ধি হওয়া উচিত।

নিশ্চয়ই যে বিষয়গুলো এখানে উল্লেখ করলাম তা দেহে যে ভৌত বিক্রিয়া ঘটে তারই ফলাফল। তবুও একজন মানুষ যে অনুধ্যান করে, সে আশ্চর্যান্বিত হয় ঃ কেমনে

যে সব বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন

এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয়? কে দেহের ভেতর হরমোন ও এনজাইম ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু স্থাপন করেছিলেন যা প্রত্যেক বস্তুর বৃদ্ধি নির্ধারণ করে? এবং কে এদের পরিমাণ ও নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে?

নিঃসন্দেহে এগুলো যুগপৎ ঘটনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা দাবি করা অসম্ভব। মানবদেহের গঠনকারী কোষ কিংবা নির্জীব পরমাণু যা কোষ গঠন করে তার পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া অসম্ভব। এটা স্পষ্ট যে, এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহর আর্ট যিনি আমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।

চলের পথে ...

ঘুম থেকে জাগার পরেই এবং সকালে প্রস্তুতি নিয়ে বেশির ভাগ লোক তাদের অফিস, স্কুল অথবা জগতের বাইরে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করতে পথে বের হয়। একজন বিশ্বাসীর জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এরূপ কাজকর্মের শুরু করতে এটি হল ক্ষুদ্র ভ্রমণ। আমরা বাড়ি ছেড়ে বাইরে বের হই, আমরা বহু বিষয়ের দেখা পাই যার উপর আমাদের অনুধ্যান করা উচিত। আমাদের চারদিকে হাজার হাজার লোক, গাড়ি, ছোট-বড় বৃক্ষাদি এবং অসংখ্য ঘটনা ঘটে। এখানে একজন বিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি খুবই পরিষ্কার। আমরা আমাদের চারদিকে যা দেখি তা থেকে বেশির ভাগ পেতে চেষ্টা করি। আমরা ঘটনাগুলোর কারণ সম্বন্ধে চিন্তা করি। যে দৃশ্যের আমরা সম্মুখীন হই তা আল্লাহর জ্ঞান ও ইচ্ছা থেকেই ঘটে থাকে। অতএব, এর

পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকা উচিত। যেহেতু আল্লাহ আমাদের বাইরে চলতে সক্ষম করেছেন এবং আমাদের সম্মুখে এই প্রতিচ্ছবিগুলো স্থাপন করেছেন, এদের মধ্যে কিছু দেখার ও চিন্তার ব্যাপার আছে। যে মুহূর্তে আমরা নিদ্রা থেকে জাগি, তখন আমরা এই পৃথিবীতে প্রভুর কাছ থেকে পুরস্কার পেতে আর একটি দিন পাওয়ার জন্য আল্লাহর প্রতি শুকুর করি। এখন আমরা ভ্রমণ শুরু করছি যার মাধ্যমে আমরা এই পুরস্কার পেতে পারি। এগুলো অবগত হয়ে আমরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবি ঃ *আমিই করে দিয়েছি দিবসকে জীবিকা অর্জনের জন্য। (সূরা নাবা ঃ ১১)* এই আয়াত অনুসারে দিন কি কাজে কাটাবে যা অন্য মানুষের উপকারে আসে এবং আল্লাহ্ খুশি হন এমন কাজের পরিকল্পনা করি।

যখন আমরা মনে এই পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের গাড়ি অথবা অন্য কোন যানবাহনের কাছে পৌছি আমরা আবার আল্লাহর শুকুর করি। গন্তব্য যতদূরই হোকনা কেন আমাদের সেখানে যাবার উপায় আছে। সুবিধার জন্য আল্লাহ মানুষের জন্য যাতায়াত করতে বহু যানবাহন তৈরি করেছেন। বিশেষভাবে সাম্প্রতিক প্রযুক্তিগত উন্নতি অনেক সম্ভাবনা প্রবর্তন করেছে যেমন—গাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ, জাহাজ, হেলিকপ্টার, বাস ইত্যাদি। এগুলো ভেবে একজন আরও একটি বিষয়ে স্মরণ করে ঃ আল্লাহই যিনি মানুষের সেবায় প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছেন।

প্রতিদিন বিজ্ঞানীগণ নব নব আবিষ্কার উদ্ভাবন নিয়ে আসছেন এবং যা আমাদের জীবন যাপনে সুবিধা করে দিয়েছে। এগুলো আল্লাহ যে উপায় উপকরণ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন তা থেকেই সম্পন্ন করেন। যে ব্যক্তি চিন্তা করে তার সেবায় এগুলো দেবার জন্য প্রভুর শুকুর গোজারি করে ভ্রমণ করেন।

এরূপ চিন্তা সহকারে আমাদের গন্তব্যে অগ্রসর হওয়া কালে একগাদা জঞ্জাল, নোংড়া গন্ধ, সীমাবদ্ধ নোংড়া জায়গা, রাস্তার দুই পাশে দেখতে পেয়ে বিভিন্ন চিন্তা আমাদের মনে উদ্রেক ঘটায়।

এই পৃথিবীতে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন অধিষ্ঠান এবং দর্শনীয় স্থান যা দ্বারা আমরা বেহেশত ও দোজখ প্রত্যক্ষ করি অথবা তুলনা করে অনুমান করি এগুলো কেমন হবে। গাদাগাদা আবর্জনা, বিশ্রী গন্ধ, সীমাবদ্ধ অন্ধকার জায়গা আমাদের আত্মায় নিদারুণ বেদনা আনে। এরূপ স্থানে কেউ কখনও থাকতে চায় না। এই সব অবস্থা একজনক দোযখের কথা স্মরণ করায়। এবং একজন যখন এরূপ দৃশ্যের সম্মুখীন হয় দোযখ সম্পর্কিত আয়াতসমূহ তার মনে পড়ে যায়। আল্লাহ অনেক আয়াতে দোযখের অপ্রিয় দৃশ্য, অন্ধকার ও ময়লা আবর্জনার বর্ণনা চিত্রিত করেছেন ঃ

> *আর বাম দিকের দল, কতই না হতভাগা বাম দিকের দল; তারা থাকবে আগুন ও ফুটন্ত পানির দিকে। এবং কৃষ্ণবর্ণের ধুম্র ছায়ায় যা ঠাণ্ডাও নয় আরামদায়কও নয়। (সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৪১-৪৪)*
>
> *এবং যখন তাদেরকে দোযখের কোন সংকীর্ণ স্থানে হাত পা বাধা অবস্থায় নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেথায় কেবল মৃত্যুকেই ডাকবে।*
>
> *তাদেরকে বলা হবে; তোমরা এক মৃত্যুকে ডেকোনা, বরং বহু মৃত্যুকেই ডাক।*
>
> *(সূরা ফুরকান ঃ ১৩-১৪)*

কোরআনের এই আয়াত স্মরণ করে আমরা আল্লাহর নিকট দোযখের প্রচন্ডতা থেকে পানাহ চাই এবং আমাদের ভুল-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। যিনি এ ধরনের চিন্তার সদ্ব্যবহার করেনা উপরন্তু প্রতি ঘটনায় বিড়বিড়, ক্ষোভ প্রকাশ, ত্রস্তব্যস্ততা এবং দাগী অপরাধীদের খোঁজে তার দিন কাটে। আবর্জনা জমা করে রাখেন এমন লোক এবং পৌরসভা যে তা সরাতে দেরি করে তার প্রতি তিনি প্রচন্ডভাবে ক্ষুব্ধ থাকেন।

সারাদিন অনেক ব্যাপারে তার মন ব্যতিব্যস্ত থাকে—যেমন রাস্তার গর্ত, যারা যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে, আবহাওয়াবিদ কর্তৃক পূর্বাভাসকৃত খারাপ আবহাওয়ার কারণে তার দেহ ভিজে যাওয়া এবং সবশেষে বস কর্তৃক অন্যায্য বকাবকি। এই নিষ্ফল চিন্তা-ভাবনা তার পরবর্তী জীবনে কোন কাজে লাগবেনা। একজন এত সব বিষয় পাশ কেটে চলা উচিত কিনা তা ভাবতে বন্ধ করতে হয়। সত্য বটে, বহু লোক দাবি করে যে প্রকৃত কারণ যা চিন্তা করতে দেয় না তা হল সংগ্রাম, যা তাকে এই পৃথিবীতে চালিয়ে যেতে হয়। তারা বলে যে তারা চিন্তা-ভাবনা করতে পারেনা, কারণ হল সমস্যা যেমন খাদ্য, বাসস্থান ও স্বাস্থ্য সমস্যা। এগুলো অবশ্য অজুহাত ছাড়া কিছুই নয়। একজনের দায়িত্ব ও অবস্থা তার চিন্তা করার ব্যাপারে কিছু করার থাকে না। যে আল্লাহর খুশী অর্জনের জন্য চিন্তা করতে চেষ্টা করে, তিনি তার পাশে আল্লাহর সাহায্য পাবেন। তিনি দেখবেন যে বিষয়গুলো তার জন্য সমস্যা তা একের পর এক সমাধান হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন যাবে আর চিন্তা করার আরও সময় বাঁচাতে সক্ষম হবেন। এটা কেবল বিশ্বাসীরাই বুঝে থাকেন ও অনুভব করেন।

বহু বর্ণিল জগত একজনকে কি ভাবায়?

আমার যাত্রা চলতে থাকে, আমরা আমাদের চারদিকে আল্লাহর নিদর্শন এবং সৃজনশীল অলৌকিত্ব দেখতে পাই এবং এসবের কথা ভেবে আমাদের প্রভুর মহিমাকে সম্মান প্রদর্শন করি। যখন আমরা গাড়ির জানালায় বাইরে তাকাই আমরা এক বহু বর্ণিল জগত দেখতে পাই। তখন আমরা ভাবি ঃ "যদি জগতটা বহু বর্ণিল না হত, তাহলে প্রতিটি বস্তু কিরূপ হত।"

নিচের ছবির দিকে তাকাও এবং চিন্তা কর। আমরা কি একই আনন্দ পাব যেমন আমরা এখন পাই সাগর অথবা পার্বত্য ভূ-প্রাকৃতিক দৃশ্য অথবা বর্ণ ছাড়া ফুল থেকে? আকাশের প্রতিবিম্ব ফল, প্রজাপতি, জান্নাতের পোষাক ও মুখণ্ডল এখন যেমন আনন্দ দেয় তেমন আনন্দ দিত? এটা আমাদের প্রভুর থেকে এক অনুগ্রহ যে আমরা এক রোমাঞ্চকর বহু বর্ণিল পৃথিবীতে বাস করছি। আমরা প্রকৃতিতে যে প্রতিটি বর্ণ দেখি জীবের বর্ণের নিখুঁত প্রীতিকর সংমিশ্রণ, এসব হল আল্লাহর অসমকক্ষীর শিল্পকর্ম এবং অনন্য সৃষ্টির নিদর্শন। একটি ফুলের, অথবা এক পাখির বর্ণসমূহ এবং এই বর্ণসমূহের প্রীতিকর সংমিশ্রণ, বর্ণের মধ্যে স্নিগ্ধ অন্যোনক্রিয়া, সত্য কথা যে কিছু আমাদের প্রকৃতির চোখকে বিঘ্নিত করেনা। উদাহরণস্বরূপ, সাগরের রঙ, আশপাশে এবং বৃক্ষাদির রঙসমূহ এমন মাত্রায় আছে যা আমাদের শান্তিদান করে এবং আমাদের চোখের দৃষ্টিকে চরম পরিশ্রান্ত করেনা, আল্লাহর সৃষ্টির উৎকর্ষতা প্রদর্শন করে। এসবের উপর অনুধ্যান করে আমরা বুঝতে পারি যে প্রত্যেক জিনিস যা আমরা আমাদের চারপাশে দেখি তা হল আল্লাহর অসীম জ্ঞান ও অসীম শক্তিরই কীর্তি। এগুলোর বদলে আল্লাহ আমাদের কবুল করেছেন, আমরা আল্লাহকে ভয় করি, তাঁর অকৃতজ্ঞ না হতে তার পানাহ চাই। কোরআনে আল্লাহ রঙ এর উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেন কেবল ঐ সকল লোক যাদের জ্ঞান আছে, তাদেরই আল্লাহর প্রতি ভয় থাকে। অন্যত্র আল্লাহ পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে বিশ্বাসীরা অনবরত অনুধ্যান করে এবং তাদের ধীশক্তি ব্যবহার করে, চিন্তা করে তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে এবং তাদের এ অনুধ্যান থেকে ফয়সালা পেয়ে থাকে।

> *"তুমি কি লক্ষ্য করনি? আল্লাহ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। তারপর আমি তা দ্বারা নানা বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করি। আর পর্বতমালারও রয়েছে নানা বর্ণের গিরিপথ সাদা, লাল ও ঘোর কাল।*
>
> *আর এরূপে মানুষ, বিভিন্ন প্রাণী ও চতুষ্পদ জন্তু বিভিন্ন বর্ণের হয়ে থাকে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।" (সূরা ফাতির ঃ ২৭-২৮)*

পথে শবযান দেখে একজনের কি চিন্তা করা উচিত

একজন গন্তব্যে ছুটে যাওয়ার পথে অকস্মাৎ শবদেহের সম্মুখীন হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে, একজন নিজের দিকে ফিরে তাকানোর জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ

সুযোগ। যে দৃশ্য তিনি দেখেন তা তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়। একদিন তাকেও শবযানে দেখা যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই, সে কতটুকু মৃত্যুকে এড়িয়ে চলবে এটাও কোন বিষয় নয়, আজ হোক কাল হোক মৃত্যু তার দেখা পাবে। তার বিছানায় হোক, অথবা চলার পথে, অথবা কোন ছুটিতে এটা নিশ্চিত যে সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে। কারণ মৃত্যু হল অনিবার্য বাস্তবতা।

ঐ সময়ে একজন মোমিন আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াত স্মরণ করে ঃ

"প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর আমারই কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আমি অবশ্যই তাদের স্থলে দান করব জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদসমূহে যার নিম্নদেশে নহর প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। কত উত্তম পুরস্কার ঐসব নেককারদের জন্য। যারা ছবর করে ও স্বীয় রবের উপর ভরসা রাখে।"

(সুরা আনকাবুত ঃ ৫৭-৫৯)

নিশ্চয়ই তার দেহ কফিনে রাখা হবে, আত্মীয়-স্বজনেরা মাটি দিয়ে ঢেকে দেবে, তার আদ্য নাম, বংশ নাম পদবি, কবর পাথরে খোদিত করা হবে, এই সব বিবেচনা পৃথিবীর সাথে আসক্তি দূরীভূত করে। যিনি আন্তরিক ও বাস্তবসম্মতভাবে এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তিনি দেখেন, যে দেহ একদিন মাটিতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তার প্রতি দাবি রাখা কতটুকু নির্বুদ্ধিতাজনক।

সূরা আনকাবুতের আয়াতে আল্লাহ মৃত্যুর পর বেহেশতের খুশির সংবাদ দিয়েছেন তাদেরকে যারা ধৈর্য্যশীল এবং আল্লাহর বিশ্বাস রাখে। এই কারণে মোমিনগণ তারা একদিন মারা যাবে, এই চিন্তা করে বেহেশত লাভ করার উদ্দেশ্যে। সঠিক কাজকর্মে এবং আল্লাহর নির্দেশিত সুন্দর চরিত্রসহ, আন্তরিকভাবে আল্লাহ অভিমুখী জীবনযাপনে সচেষ্ট হয়। প্রতি সময়ে তারা মৃত্যুর সান্নিধ্য চিন্তা করে, তাদের সংকল্প বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চতম মূল্যবোধ গ্রহণ করতে চেষ্টা চালায় এবং তাদের জীবনব্যাপী ক্রমাগতভাবে এগুলোর উন্নয়ন সাধন করে।

অপরপক্ষে, যারা অন্যরকম চিন্তার অগ্রাধিকার দেন এবং দুর্ভাবনাপূর্ণ নিষ্ফল জীবন কাটান, তারা ভাবেন না যে একই বিষয় তাদের উপর একদিন আপতিত হবে, এমনকি এমন ঘটনায় যখন তারা শবযানের সম্মুখীন হন এবং যদিও তারা প্রতিদিন গোরস্থান অতিক্রম করেন এবং এমনকি যখন তাদের ছেড়ে তাদের কোন কোন প্রিয় মানুষ মারা যান।

দিনের বেলায় ...

সারাদিনব্যাপী সকল ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার সময়, একজন মোমিন সর্বদা আল্লাহর আয়াতের কথা ভাবেন এবং ঘটনাবলির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিগূঢ় বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করেন।

তিনি প্রতিটি অনুগ্রহ বা ভাল বৈশিষ্ট্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যাতে আল্লাহর অনুমোদন থাকে। যে ব্যক্তি মোমিন তার জন্য যে স্থানটিতে তিনি

থাকেন সেটির গুরুত্ব অতি সামান্য। তিনি স্কুলে থাকুন, কাজে থাকুন অথবা দোকানে কেনাকাটায় থাকুন আল্লাহ যে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এই সত্যের উপর চিন্তা করে তিনি দেখতে চেষ্টা করেন, সব ঘটনাটির অভ্যন্তরে গোপন উদ্দেশ্য এবং সৌন্দর্যাবলি যা তিনি সৃষ্টি করেন এবং তিনি প্রভুর আয়াত মান্য করে জীবন পরিচালনা করেন। একজন মোমিনের এই মনোভাব যা কোরআনে বর্ণিত তা নিম্নরূপ ঃ

> *এমন লোকেরা যাদেরকে ভুলাতে পারেনা ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং নামায করা থেকে ও যাকাত প্রদান করা থেকে, তারা ভয় করে সেই দিনকে, যাদের অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ বিপর্যস্থ হয়ে পড়বে। যেন আল্লাহ তারা যা করেছে তার জন্য তাদেরকে উত্তম পুরষ্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও অধিক দেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিজিক দান করে। (সূরা নূর ঃ ৩৭-৩৮)*

কাজ করার সময় একজন যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তা তাকে কি ভাবায়

মানুষ সারাদিন বহু কঠিন অসুবিধার মুখোমুখি হয়। যাহোক, যে ধরনের কঠিন বিষয়ের মুখোমুখী হোক না কেন, তার দরকার আল্লাহর বিশ্বাস রাখা এবং এরূপ চিন্তা করা উচিত ঃ "আমরা যা করি তার প্রত্যেক ব্যাপারে এবং এই পৃথিবীর জীবনে যা ভাবি তাতে আল্লাহ পরীক্ষা করেন। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা যা থেকে আমরা মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি না হারাই। অতএব, যদি এমন কোন জিনিস যা আমরা ভাবিনা তেমনি ব্যাপারে অসুবিধার সম্মুখীন হই অথবা আমরা ভাবি যে বিষয়গুলো সঠিক পথে এগুচ্ছেনা, আমাদের কখনও ভুলা উচিত নয় যে এই ঘটনাগুলো আমাদের বিরুদ্ধে সন্নিবেশিত করা হয়েছে আমাদের আচরণ পরীক্ষার জন্য।"

এই সব ভাবনা যা একজনের মনে ভাবনার উদ্রেক করে তা একজন সারা দিনে যে বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র ঘটনাবলির সম্মুখীন হয় তার ক্ষেত্রে সত্য। উদাহরণস্বরূপ আমরা ভুল বুঝাবুঝি অথবা অসতর্কতার জন্য অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে থাকি; আমরা বিদ্যুতহীনতার জন্য কম্পিউটারের একটি ফাইল হারাতে পারি, একজন ছাত্র কঠোর পড়াশুনা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় ফেল করতে পারে, আমাদের দিনগুলো কোন কাজের অগ্রগতিতে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির জন্য প্রতীক্ষার সারিতে কাটতে পারে, হারানো দলিলপত্রের কারণে কাজগুলো ভুল পথে চলতে পারে, একজন অতি জরুরি ভাবে পৌছতে হবে এমন স্থানে যাবার পথে প্লেন অথবা বাস ধরতে ব্যর্থ হতে পারে। এরূপ অসংখ্য ঘটনা যা প্রত্যেকের জীবনে সম্মুখীন হতে পারে এবং প্রায় নিশ্চিতভাবে হবেই এবং একে একটি কঠিন 'ঝামেলা' বিবেচনা করে।

এই সব ঘটনায় একজন বিশ্বাসী তাৎক্ষণিকভাবে চিন্তা করে যে আল্লাহ তার আচরণ ও ধৈর্য্যকে পরীক্ষা করছেন এবং যে এটি একজনের জন্য অর্থহীন যে মারা যাবে এবং পরকালে হিসাব দেবে এরূপ ঘটনা তাকে বয়ে নিয়ে যাবে এবং এদের সম্বন্ধে দুঃখ করে সময় হারাবে। সে জানে যে এই সব ঘটনাবলির পশ্চাতে মঙ্গল আছে। সে কোন ঘটনায়

কখনও 'হায়' বলে না, এবং তার কাজকর্মে সুবিধা করে দিতে এবং প্রত্যেক বিষয়কে ভাল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরিয়ে নিতে আল্লাহকে বলে এবং যখন অসুবিধার পরে স্বস্তি আসে আমরা উপলব্ধি করি যে, এটি আমাদের আল্লাহর নিকট প্রার্থনার জবাব; এবং যে আল্লাহ প্রার্থনার শ্রবণকারী এবং তিনি তাতে সাড়া দেন এবং আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

সারাদিন ব্যাপী এই ভাবনাগুলো ভেবে একজন কখনও নিরাশ হয়না, দুঃশ্চিন্তাবোধ করেনা, দুঃখ অনুভব করে না অথবা নিরাশায় পতিত হয় না, যে কোন কিছুর সম্মুখীন হোক না কেন, তাতে কিছুই যায় আসে না। আমরা জানি যে আল্লাহ এই সব কিছু মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তাদের জন্য আশীর্বাদ রয়েছে। তদুপরি আমরা আমাদের উপর নেমে আসে কেবল এমন বড় ঘটনায় এরূপ ভাবি না, কিন্তু আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, সব ছোট-বড় বিস্তারিত ঘটনায় যা প্রাত্যহিক জীবনে সাক্ষাৎ পাই সেক্ষেত্রে এরূপ ভাবি।

একজন ব্যক্তির কথা ভাবুন যিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তিনি যেমন ইচ্ছা করেন তেমনভাবে সমাধান করতে পারেন না এবং যিনি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন ঠিক যখন তিনি লক্ষ্যের দিকে প্রায় পৌঁছে গেছেন। এই ব্যক্তি অকস্মাৎ রেগে যান, অসুখী বিষণ্ন অনুভব করেন এবং সংক্ষেপে সকল প্রকার নেতিবাচক অনুভূতির জন্ম দেন।

যাহোক, যিনি ভাবেন যে প্রত্যেক বস্তুতে মঙ্গল আছে, তিনি দেখান এমন ঘটনার যা আল্লাহ তাকে দেখান, তার গুপ্ত উদ্দেশ্য বের করতে চেষ্টা করেন। তিনি মনে করেন যে আল্লাহ তার দৃষ্টিকে আনতে পারেন যাতে সে বিষয়ে আরও অধিকতর সুনির্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করে। তিনি সকল প্রয়োজনীয় উপায় গ্রহণ করেন এবং আল্লাহকে এই বলে ধন্যবাদ দেন ঃ "একে সাহায্য করা হোক যাতে অধিকতর মারাত্মক ক্ষতি করতে বাধা আসে।"

যে ব্যক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবার প্রচেষ্টায় বাস ধরতে ব্যর্থ হয়ে ভাবতে পারে ঃ সম্ভবত আমার বিলম্ব, হওয়া এবং বাসে না থাকা আমাকে একটি দুর্ঘটনা অথবা ক্ষতি থেকে বাঁচিয়েছে।" এগুলো কেবল সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। একজন আরও ভাবতে পারে, "এই ধরনের এরূপ বহ গুপ্ত উদ্দেশ্য থাকতে পারে।" এরূপ উদাহরণ একজনের জীবনকালে বহুগুণে বেড়ে যায়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আমাদের পরিকল্পনা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী সমাধান হয় না। আমরা যেমন পরিকল্পনা করি সমস্যা তার চেয়ে ভিন্নতর অবস্থায় দেখতে পাই। এই অবস্থায়, যিনি আত্মসমর্পিত চিত্তে আচরণ করেন, বিশেষ ঘটনার তিনি সম্মুখীন হলে, মঙ্গলের অনুসন্ধান করেন, সমৃদ্ধি লাভ করেন। আল্লাহ তার আয়াতে বলেন ঃ

> *...আর হয়ত কোন একটা বিষয় তোমাদের কাছে অপ্রিয় মনে হয় আসলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং হয়তবা কোন বিষয় তোমাদের কাছে প্রিয় মনে হয়, আসলে তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জাননা। (সূরা বাকারা ঃ ২১৬)*

আল্লাহ তার আয়াতে যেমন বর্ণনা করেন, আমরা জানতে পারি না কিন্তু আল্লাহ জানেন। অতএব আল্লাহই জানেন আমাদের জন্য কি মঙ্গলকর ও কি অমঙ্গলকর। যা মানুষের উপর বর্তায় তা হল আল্লাহ যিনি বন্ধুদের জন্য দয়ায় পরিপূর্ণ এবং সবচেয়ে ক্ষমাশীল এবং আল্লাহর কাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর।

কোন কিছু করার সময় যা ভাবা হয়

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যখন কোন কাজ করি আমাদের মনকে শূন্য হতে দেইনা এবং আমরা সব সময় ভালই চিন্তা করি। মানুষের মন একসাথে অধিক কাজ করতে সক্ষম। এক ব্যক্তি গাড়ি চালানোর সময়, ঘর-বাড়ির পরিষ্কার, কাজকর্ম করা, রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করার সাথে একই সময়ে ভাল কাজের চিন্তা ও করতে পারে।

যখন বাড়ি-ঘর পরিস্কার করে, তখন সে আল্লাহ যে তাকে নিত্যদিনের জিনিসপত্র যেমন পানি, ডিটারজেন্ট তাকে দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালবাসেন এবং মানুষকে পরিচ্ছন্ন করেন, তিনি এই কাজকে একটি এবাদতের কাজ মনে করেন এবং এর সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করেন। তদুপরি তিনি যে স্থানে বসবাস করেন তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে একটি আরামদায়ক স্থানে পরিণত করতে তিনি আনন্দ পান।

কেউ কেউ একটি চাকরি করতে গিয়ে গোপনে অবিরত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানায় যেন তিনি তার কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ভাবেন আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কোন কিছুতে তিনি সফল হতে পারেন না। আমরা এটা কোরআনে দেখতে পাই যে রাসূল যিনি আমাদের জন্য উদাহরণস্থাপন করেছেন। তিনি অবিরত গোপনে আল্লাহর দিকে ফিরে তাকান এবং কাজের সময় আল্লাহকে ভাবেন। নবী মুসা হলেন এরূপ দামি লোকদের মধ্যে একজন। দুই জন মহিলাকে পথের মধ্য সাক্ষাত পেয়ে তাদের পশুর পালকে পানি দিয়ে সাহায্য করতে গিয়ে তিনি নিম্নে উল্লেখিত শব্দাবলির দ্বারা আল্লাহর দিকে ফিরলেন ঃ

> *যখন তিনি মাদইয়ানের পানির কূপের কাছে উপনীত হলেন তখন তিনি সেখানে লোকদের একটি দলকে দেখতে পেলেন তারা নিজ নিজ জন্তুকে পানি পান করাচ্ছে এবং তাদের পেছনে দুইজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেলেন, তারা তাদের জন্তুকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি জিজ্ঞাস করলেন ঃ তোমার উদ্দেশ্য কি? তারা বলল ঃ আমরা পানি পান করাইনা, যে পর্যন্ত না রাখালেরা তাদের পশুগুলোকে নিয়ে দূরে সরে যায়। আমার পিতা নিতান্ত বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের পক্ষে পশুগুলোকে পানি পান করালেন তারপর সরে গিয়ে ছায়ার নিচে বসলেন এবং দোয়া করলেন ঃ হে আমাদের রব! যে অনুগ্রহই আমাদের প্রতি করবেন, আমি তার মুখাপেক্ষী। (সূরা কাসাস ঃ ২৩-২৪)*

এই বিষয়ে কোরআনে আর একটি উদাহরণ দেখতে পাই, তা হল নবী ইব্রাহিম ও ইসমাইলের বিষয়। আল্লাহ বলেন এই রসূলগণ যখন একত্রে কাজ করতেন তখন

মোমিনদের মঙ্গলের জন্য ভাবতেন এবং তারা তাঁর দিকে ফিরতো এবং তাদের কাজকর্মের জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাত।

"স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাইল কা'বা ঘরের ভিত নির্মাণ করছিল তখন তারা দোয়া করেছিল ঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের এ প্রয়াস কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের বানাও তোমার প্রতি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী এবং আমাদের বংশধর থেকেও তোমার প্রতি আত্মসমর্পণকারী এক উম্মত বানাও। এবং দেখিয়ে দাও আমাদের হজ্জের নিয়ম পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। নিশ্চয়ই তুমি পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের মধ্য থেকে তাদের একজন রাসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করবে, তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদের পবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (সুরা বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

একটি মাকড়সার জাল মানুষকে কি চিন্তা করায়

একজন ব্যক্তি যে তার দিন বাড়িতে কাটায় তার অনেক বিষয় চিন্তা করার থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যখন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করে, সে ঘরের কোণে দেখতে পায় মাকড়সা তার জাল বুনছে। যদি তিনি উপলব্ধি করেন এরূপ একটি প্রাণী কারও কাছে যার কোন গুরুত্ব নেই তিনি তার সম্মুখে নতুন দরজা খোলা দেখতে পাবেন। এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ তিনি তার সম্মুখে দেখেন তা এক অলৌকিক নকসা। মাকড়সা যে জাল বুনে তাতে নিখুঁত প্রতিসাম্য থাকে। ঘটনাচক্রে তিনি আশ্চর্য্য হন কেমনে ক্ষুদ্র এক মাকড়সা আশ্চর্য্যজনক নিখুঁত নকসা করার ক্ষমতা অর্জন করে এবং তিনি যদি দ্রুত গবেষণা করেন তিনি অপরাপর অসাধারণ সত্যের সম্মুখীন হন ঃ মাকড়সা যে সূতাটি ব্যবহার করে তা পূরুত্বের দিক থেকে একই পুরুত্বের রাবার সূত্রের চেয়ে শতকরা তিন ভাগের অধিক নমনীয়। মাকড়সা যে সূতা তৈয়ার করে তা এমন উৎকৃষ্টমানের যে মানুষ এটি বুলেট প্রুফ অন্তর্বাস তৈয়ারের জন্য মডেল হিসেবে ব্যবহার করে। সত্য বটে, একটি দ্রব্য যা মানুষ একটি সাদামাটা মাকড়সার জাল হিসেবে মনে করে তা বস্তুত এটা একটি পৃথিবীর অতি আদর্শস্থানীয় শিল্প দ্রব্যের সাথে সমতুল্য।

মানুষ যেমন তার চারদিকে জীবের নিখুঁত নকসা লক্ষ্য করে, সে যদি চিন্তা করতে থাকে, সে আরও আশ্চর্যজনক সত্যের সামনে উপস্থিত হবে। যখন সে একটি মাছি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যা সব সময়ই দেখে থাকে কিন্তু তার প্রতি কখনও মনোযোগ দেয় নি এবং এমনকি যার প্রতি এমনকি ক্রুদ্ধ হয়েছে এবং মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, তিনি দেখতে পারেন তার নিজেকে পরিচ্ছন্ন করার জন্য অত্যন্ত খুঁটিনাটি ও বিস্তারিত স্বভাব থাকে। মাছি ঘন ঘন কোন স্থানে অবতরণ করে এবং তার সম্মুখের ডানা এবং পেছনের ডানা পৃথকভাবে পরিষ্কার করে নেয়। তারপর সে ডানার ও মাথার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধূলাবালি পরিষ্কার করে তার সম্মুখ ও পশ্চাতের অঙ্গের সাহায্যে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে

নিশ্চিত হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার পরিষ্কার হওয়ার কাজ চালিয়ে যায়। অন্যান্য প্রকারের কীটপতঙ্গ একইভাবে নিজেকে পরিষ্কার করে থাকে, একই প্রকার খুঁটিনাটি ও একান্তভাবে মনোযোগের সাথে। এটা ইঙ্গিত প্রদান করে যে অনন্য স্রষ্টা তাদের কিভাবে পরিষ্কার করতে হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন।

একটি মাছি প্রতি সেকেণ্ডে ৫০০ শতবার তার ডানাগুলো ঝাপটায়। বস্তুত কোন মানব নির্মিত যন্ত্র এ রকম হারে চালু থাকতে পারে না। বরং ঘর্ষণের কারণে চূর্ণবিচূর্ণ ও ভস্মীভূত হয়ে যেত। যাহোক না ডানা, পেশীসমূহ, না মাছির সন্ধিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতাসের গতি ও দিক হিসেবে নিলে সে পথচ্যুত না হয়ে যে কোন দিকে চলতে পারে।

এমনকি আমাদের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার যুগে মানুষে মানুষ এই উড্ডয়নের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ও কৌশলের উদ্ভাবন থেকে অনেক দূরে। মাছি এমন নগণ্য জীব যা মানুষ ঝাড় দিয়ে পাশে সরিয়ে দেয় এবং তার প্রতি কোন মনোনিবেশ করেনা সে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন করেছে যা মানুষ এ যাবত অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। পরিষ্কারভাবে, মাছি তার সক্ষমতার গুণ ও মেধার সহায়তায় এরূপ করে থাকে তা করার দাবি করা অসম্ভব। আল্লাহ মাছিকে এসব বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্য ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন।

আমাদের চারপাশে প্রত্যেক স্থানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জীব রয়েছে আমরা যা দৈবাৎ দেখতে পাই। পৃথিবীতে এক বর্গ সেন্টিমিটার স্থান নেই যেখানে জীব পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমরা যে ঘরে বাস করি তা আনুবীক্ষণিক জীবে ভরপুর থাকে যাকে মাইট বলে। সেরূপ যে বাতাসে শ্বাস নেই তাতে অসংখ্য ভাইরাস বাস করে। মানুষ, উদ্ভিদ এবং জীবজন্তু যা মানুষ দেখতে সক্ষম কিন্তু আর জীব আছে মানুষ দেখে না, তবে তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত। আমাদের বাগানের মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আশ্চর্যজনকভাবে বেশি। যে ব্যক্তি পৃথিবীর অবিশ্বাস্য বিচিত্র জীবের উপর অনুধ্যান করে তিনি প্রাণীর নিখুঁত পদ্ধতিগুলো স্মরণ করেন। আমরা যে সব প্রাণী দেখি তা আল্লাহর শিল্পের নিদর্শন। একইভাবে আনুবীক্ষণিক জীবে বিরাট অলৌকিকত্ব লুকায়িত আছে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া অথবা যা আমাদের নিকট অদৃশ্য তাদের নিজস্ব শারীরিক নির্মাণ কৌশল থাকে। আল্লাহ তাদের আবাস,খাবার গ্রহণের পদ্ধতি এবং প্রজনন ও আত্মরক্ষা পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলোর উপর অনুধ্যান করে সে আল্লাহর আয়াত স্মরণ করে ঃ

> *"আর এমন অনেক প্রাণী আছে যারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহ করে রাখে না, আল্লাহই তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করে এবং তোমাদেরকেও। তিনি সব শুনেন সব দেখেন। (সূরা আনকাবুত ঃ ৬০)*

রোগব্যাধি মানুষকে কী চিন্তা করায়

মানুষ এমন এক প্রাণী যার অনেক দুর্বলতা আছে এবং যাকে তার অসম্পূর্ণতার সাথে চলতে অবিরত প্রয়াস চালাতে হয়। অসুস্থতা সবচেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে মানুষের

দুর্বলতার প্রকাশ ঘটায়। অতএব যখন আমাদের বন্ধু অথবা আমরা নিজে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমাদের এর ভেতর লুকানো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে। আমরা যখন চিন্তা করি, এমনকি ফ্লু যা একটি সাধারণ রোগ হিসেবে বিবেচিত, তা আমাদের শিক্ষা প্রদান করে যা থেকে আমরা সতর্কতা পেতে পারি। যখন এরূপ রোগে আক্রান্ত হই আমরা নিম্নলিখিত চিন্তা করতে পারি, প্রথমতঃ ফ্লুর প্রধান কারণ হল ভাইরাস যা এত ক্ষুদ্র যে আমাদের খালি চোখে তা অদৃশ্য। যাহোক এরূপ একটি জীব ৬০-৭০ কেজি ওজনের মানুষের শক্তি কমায়ে দেয় এবং তাকে এমন অবসন্ন করে যে তাকে হাঁটা চলা অথবা কথাবার্তা বলতেও বাধার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সময়ই যে বড়ি আমরা সেবন করি ও খাদ্য খাই, তা কোন ভাল কিছু করেনা। একমাত্র যা আমরা করতে পারি তা হল বিশ্রাম ও অপেক্ষা করা। শরীরে যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। ক্ষুদ্র জীব দ্বারা আমাদের হাত পা বাধা। এরূপ অবস্থা সম্বন্ধে যা প্রথম স্মরণ করি তাহল আল্লাহর নিম্নলিখিত আয়াত যাতে নবী ইব্রাহিম বলেন ঃ

> *"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে পথ দেখান এবং তিনি আহার করান এবং তিনিই আমাকে পান করান এবং যখন আমি পীড়িত হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করে, যখন তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর পুনরায় জীবিত করাবেন এবং আমি আশা করি কেয়ামতের দিন তিনিই আমার ভুল-ত্রুটি মার্জনা করবেন। হে আমার রব! আমাকে হেকমত দান করুন এবং আমাকে পূণ্যবান লোকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করুন। (সূরা শুআরা ঃ ৭৮-৮৩)*

এক ব্যক্তি যখন যে কোন ধরনের রোগের শিকার হয়, তার উচিত তার রুগ্ন অবস্থায় ও সুস্থ অবস্থার মধ্যে তুলনা করা ও চিন্তা করা। তাঁর অসুস্থতার সময়ে তার সুস্থ অবস্থার কথা উপলব্ধি করা উচিত, কত জোড়ালো ভাবে সে বুঝল আল্লাহ তার জন্য প্রয়োজন এবং উদাহরণস্বরূপ তার অপারেশন হওয়ার পথে কত আন্তরিক ও জোড়ালোভাবে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে।

আমরা যখন কারও অসুস্থতা প্রত্যক্ষ করি, তখনই আমাদের আল্লাহকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা উচিত যখন আমরা আমাদের সুস্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করি। যখন মোমিন ব্যক্তি পঙ্গু পা যুক্ত এক ব্যক্তি দেখেন তখন তার ভাবা উচিত তার নিজের পা তার কত বড় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত। সে বুঝতে পারে যখন যেখানে চায় তার হেঁটে চলার সামর্থ্য আছে, যখনই সে সকালে ঘুম থেকে উঠে, প্রয়োজনে দৌড়ে ছুটে এবং কারও সহায়তা ব্যতীত নিজের দিকে খেয়াল রাখতে পারে, এগুলো প্রত্যেকটি আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। যখন সে ভাবে এবং এরূপ তুলনা করে, সে তার নিকট প্রদত্ত আশীর্বাদের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে।

গোঁয়ার, নষ্ট, অশালীন, বদমেজাজী লোকের সাথে সাক্ষাতে একজনকে ভাবায়?

দিনের বেলা অফিস অথবা স্কুলে একজন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম মানুষের সম্মুখীন হয়। এই সব লোক আল্লাহ ভীরু ভাল মেজাজের নাও হতে পারে। একজন মোমিন যখন এরূপ লোকের সম্মুখীন হয় যখন তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়না বরং আল্লাহর আদেশকৃত আচরণের প্রতি শক্ত করে লেগে থাকে। তিনি জানেন যে, এই সব লোকের খারাপ চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ আল্লাহর প্রতি ভয় কম থাকার কারণে এবং তাদের পরকালের অবিশ্বাসের কারণে। এবং নিম্নলিখিত কথা তার মনে বয়ে যায় ঃ আল্লাহ মানুষকে জাহান্নামের যন্ত্রণার ব্যাপারে সতর্ক করেন এবং তাদের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা ভাবতে বলেন এবং এই দুনিয়ার জীবনে তাদের আচরণ সংশোধন করতে বলেন, বিনীতভাবে আল্লাহর দিকে আন্তরিকভাবে ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেন। যদি তিনি উপলব্ধি করেন যে তিনি এই হুমকীর মুখোমুখি, তিনি নিশ্চয়ই এড়িয়ে যেতে সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তথাপি যারা একে নিয়ে ভাবেনা এবং এর গুরুতর অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে না এমন কাজ করে যে তাদের জন্য যে আগুন ও নির্যাতনের স্থান নেই যা তাদের জন্য নির্মিত হচ্ছে।

যারা এই সত্য সম্বন্ধে অবহিত তারা আরও গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ব্যাপারগুলো স্মরণ করেন। যখন জাহান্নামের আগুনের কিনারায় অপেক্ষা করতে থাকবে এদের প্রত্যেকে লোকের মনোভাব সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম হবে। যদি কেউ আজ আল্লাহর উপর সকল বিশ্বাস হারিয়ে, বিনষ্ট, নির্লজ্জ এবং গোঁয়ার্তুমি আচরণ প্রদর্শন করতে দ্বিধা করেনা, হিসাবের দিন তাকে পাকড়াও করা হবে এবং মাটিতে টানতে টানতে দোজখের গর্তের সম্মুখে আনা হবে এবং অবিরত খারাপ অবস্থায় পতিত হতে থাকবে। তখন তার মুখের অভিব্যক্তি, তার মনোভাব, যে ভঙ্গিমায় কথা বলে অথবা যে কথাগুলো বলতো সেগুলো যেমন ব্যবহার করে, তাদের যেমন হওয়া উচিত ছিল তেমন হয় না। যদি কোন আক্রমনাত্মক, উদ্ধত অবিশ্বাসী স্বভাবগতভাবে অপরাধ করে এবং তার কোন মানবিক বৈশিষ্ট্য নেই, তাকে দোযখের আগুনের কাছাকাছি আনা হবে, সে যখন এর নির্যাতন দেখবে, চিরকাল কষ্ট অনুভব করবে।

যারা তাদের দ্বীনকে
খেলতামাসার বস্তু বানিয়েছিল
এবং পার্থিব জীবন তাদের
প্রতারিত করেছিল। সুতরাং
আজ আমি তাদেরকে ভুলে
যাব, যেমন তারা ভুলেছিল
তাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে
এবং যেমন তারা আমার
আয়াতসমূহ অমান্য করত।
(সূরা আ'রাফ ঃ ৫১)

যে ব্যক্তি ধর্ম অনুসারে জীবনযাপন না করে এবং পার্থিব জীবনে আল্লাহর এবাদত না করার সকল প্রকার অজুহাত তৈরি করেন, তিনি দোযখের দরজায় অপেক্ষা করার সময় একই ধরনের অজুহাত তৈরি করতে সক্ষম হবে না। সে সময় আর সম্ভব হবে না যদিও অবিশ্বাসীরা এটা সম্পন্ন করতে চায়, প্রার্থনার ও আর কোন জবাব পাওয়া যাবেনা যদিও অবিশ্বাসীরা আগ্রহের সঙ্গে প্রার্থনা করে। যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা কখনও এই বিষয়গুলো ভুলে যায় না। তিনি দোযখের আগুনের কথা মনে করেন এবং তার গুণেই তিনি ভাল আচরণ, ভাল কথা, সৎ চরিত্র কি দেখে থাকেন। যেহেতু তার দোযখের উপর প্রবল বিশ্বাস আছে এবং অবিরত এটা নিয়ে ভাবেন, যে তিনি সর্বদা এমনভাবে কাজ করেন যে তিনি দোযখের আগুনের পাশেই আছেন এই সত্য সম্বন্ধে ভাবেন যে তিনি যা করেন তার জন্য হিসাব দিতে ডাকা হবে।

আল্লাহ মানুষকে দোযখ ও হিসাব নিকাশের (হাশরের দিন) দিন সম্পর্কে ভাবতে আহ্বান করেন ঃ

"যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের কৃতকর্ম ভাল কাজসমূহ সামনে উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তাও পাবে, সেদিন সে ব্যক্তি তার ও সে সব মন্দ কাজের মধ্যে দূর ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ নিজের সত্ত্বা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাময়।
(সূরা আলে-ইমরান ঃ ৩০)

খাবার সময়কালে

আল্লাহই সে সত্ত্বা, যিনি জমিনকে তোমাদের জন্য করেছেন বাসস্থান এবং আসমানকে বানিয়েছেন ছাদ। আর তিনিই তোমাদের আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতিকে করেছে অতি সুন্দর, আর তিনি তোমাদের দান করেছেন উত্তম রিজিক। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ কত মহান বরকতময়। [সূরা গাফির (মুমিন) ঃ ৬৪]

আল্লাহ এই পৃথিবীর মানুষকে বিচিত্র, খাটি সুস্বাদু খাদ্য ও পানীয় দান করেছেন। নিশ্চয়ই এগুলো মানুষের প্রতি আল্লাহর অন্তহীন দয়া ও ক্ষমার বহিঃপ্রকাশ। মানুষ কেবল এক প্রকার খাদ্য ও পানীয় দ্বারা ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারত, কিন্তু আল্লাহ তাদের উপর সংখ্যাহীন নিয়ামত দান করছেন ঃ ফল, শাকসব্জি এবং বিভিন্ন জাতের মাংস।

একজন বিশ্বাসী যিনি জানেন যে এই সব নিয়ামত আল্লাহর তরফ থেকে এসেছে তিনি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেন এবং প্রতিবার খেতে খেতে বসে আল্লাহর প্রতি ধন্যবাদ জানান।

খাবারের সময় পরিবেশিত ফলফলাদি একজনকে কি ভাবায়?

কোরআনের বহু আয়াতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন মানুষকে বহু রকমের খাদ্যসামগ্রী দান করেছেন। একজন ব্যক্তি খেতে বসতে গিয়ে তার সামনে এই সব

খাবার থাকে। খাবার টেবিল মাটি থেকে জন্মানো বহু রকমের শাকসব্জি ও অনেক প্রাণীর মাংস দ্বারা ভরপুর থাকে। মানুষ প্রকৃতিগত তবে এই সকল খাদ্যে আনন্দ পায়। এই সকল খাদ্য একটি আর একটির চেয়ে সুস্বাদু এবং একই সময়ে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন। আসুন আমরা চিন্তা করি এই সকল পুষ্টিকর খাদ্য যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য এত প্রয়োজন, সেগুলো যদি স্বাদহীন অথবা খারাপ স্বাদের অথবা এদের সুন্দর স্বাদের থাকা সত্ত্বেও আমাদের জন্য ক্ষতিকর" অথবা আমাদের কেবল বেঁচে থাকার জন্য সামান্য কয়েকটি খাদ্য থাকত, তাতে আমরা কি করতে পারতাম? আমাদের প্রতি আল্লাহর দয়া, আল্লাহ যে স্বাদহীন খাদ্য ও পানিয় না দেওয়ার কারণে নয় বরং আমাদের এমন একটি ছবি যা আমাদের টেবিলে দেখিতে কারণে। এমনকি একজন যদি কেবল ফলের কথাই চিন্তাই করে, তিনি বিপুল অনুগ্রহের কথারই স্বীকৃতি দেবেন।

যে বিবেকবান ব্যক্তি যিনি খাবার বহু প্রকারের ফল দেখতে পান তিনি যা চিন্তা করেন তা নিম্নরূপ ঃ

◆ কালো বর্ণের মাটি থেকে উত্থিত বিবিধ বর্ণের, বিবিধ গন্ধের, অত্যন্ত পরিষ্কার ভিতরের বস্তু যার প্রত্যেকটির আছে মনোরম স্বাদ সেই ফলগুলো হলো মানুষের প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর বিশাল অনুগ্রহ।

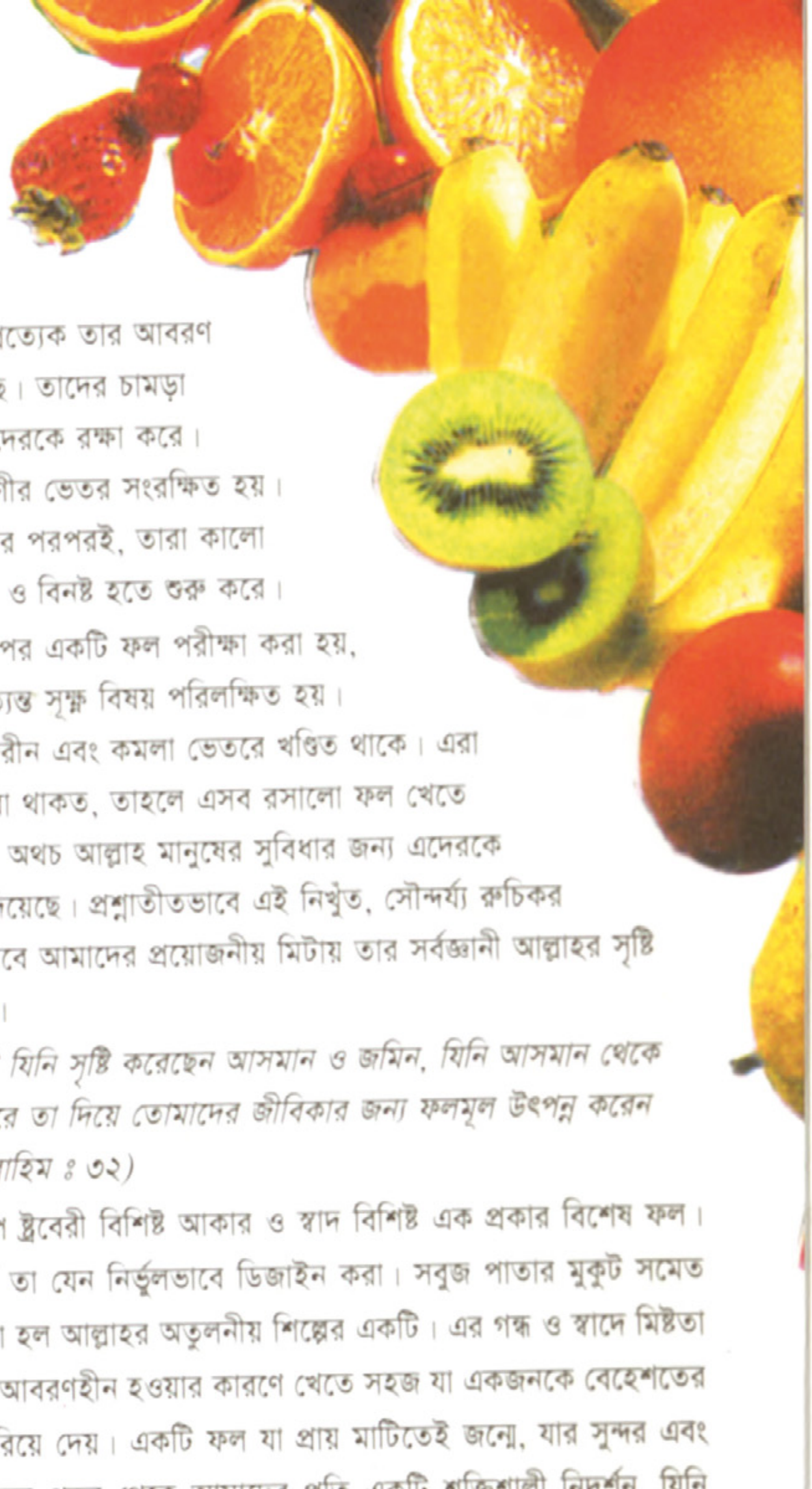

◆

কলা, ট্যানজেবীন,
কমলা, বাঙ্গী, তরমুজ,
সংক্ষেপে, সকল ফল প্রত্যেক তার আবরণ
সমেত সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের চামড়া
ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে এদেরকে রক্ষা করে।
তাদের গন্ধ এই আবরণীর ভেতর সংরক্ষিত হয়।
এদের আবরণী সরানোর পরপরই, তারা কালো
বর্ণে ধারণ করতে শুরু ও বিনষ্ট হতে শুরু করে।

◆ যখন একটির পর একটি ফল পরীক্ষা করা হয়,
তাদের তাৎপর্য্যের অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় পরিলক্ষিত হয়।
উদাহরণস্বরূপ ট্যানজেরীন এবং কমলা ভেতরে খণ্ডিত থাকে। এরা
যদি একটি অখণ্ড টুকরা থাকত, তাহলে এসব রসালো ফল খেতে
অধিকতর কঠিন হত। অথচ আল্লাহ মানুষের সুবিধার জন্য এদেরকে
খন্ডিত আকারে রূপ দিয়েছে। প্রশ্নাতীতভাবে এই নিখুঁত, সৌন্দর্য্য রুচিকর
ডিজাইন যা পরিপূর্ণভাবে আমাদের প্রয়োজনীয় মিটায় তার সর্বজ্ঞানী আল্লাহর সৃষ্টি
নিদর্শনসমূহের একটি।

> *আল্লাহ তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও জমিন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফলমূল উৎপন্ন করেন ...। (সূরা ইব্রাহিম ঃ ৩২)*

◆ উদাহরণস্বরূপ ষ্ট্রবেরী বিশিষ্ট আকার ও স্বাদ বিশিষ্ট এক প্রকার বিশেষ ফল।
এর উপর যে প্যাটার্ন তা যেন নির্ভুলভাবে ডিজাইন করা। সবুজ পাতার মুকুট সমেত
এর সতেজ আকার তা হল আল্লাহর অতুলনীয় শিল্পের একটি। এর গন্ধ ও স্বাদে মিষ্টতা
এবং এটি বীজহীন ও আবরণহীন হওয়ার কারণে খেতে সহজ যা একজনকে বেহেশতের
ফলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি ফল যা প্রায় মাটিতেই জন্মে, যার সুন্দর এবং
আকর্ষণীয় বর্ণ আমাদের প্রভুর থেকে আমাদের প্রতি একটি শক্তিশালী নিদর্শন, যিনি
একে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তার সৃষ্ট বস্তুতে তার শিল্প বিজ্ঞতা এবং জ্ঞান প্রকাশ করেন।

◆ প্রতি মৌসুমে বিভিন্ন প্রকারের ফল জন্মে। এগুলো হল চিন্তা করার আর একটি
বিষয়। এটা হল মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার উদাহরণস্বরূপ যেমন
শীতকালে মানুষের প্রয়োজনীয় সি ভিটামিন সমৃদ্ধ ফল যেমন, ট্যানজেরীন কমলা এবং
আঙ্গুর পাওয়া যায়। অপরদিকে গ্রীষ্মকালে ফল যেন চৈরি, পিপাসা নিবারণকারী বাঙ্গী,
তরমুজ, এবং পীচ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

◆ শাখা-প্রশাখায় ফলফলাদির মনোমুগ্ধকর চিত্র অথবা যেমন তারা লাগানো থাকে, তা হল আমাদের প্রতি আল্লাহর একটি উপহার। শত শত ফলের বাহ্যত হাড়-শুকনা শাখায় শক্তভাবে লাগানো, ভেতরে রসালো যাদের কিছু বিশেষভাবে বাইরে মসৃণ, এগুলোর চিত্র প্রমাণ করে প্রত্যেকটি আল্লাহ সমৃদ্ধি করেছেন। উদাহরণস্বরূপ আঙ্গুর ফলের থোকা এমন দেখায় যেন একটির পর একটি রাখা হচ্ছে। আল্লাহ এদের প্রত্যেকটি অনুপম সৃষ্টি হিসেবে সৃজন করেছেন। শাখা-প্রশাখায় এদের এমন ফ্যাশনে সম্বলিত অবয়ব যা মানুষের প্রতি আবেদন সৃষ্টি করে। এই কারণে যখন কোরআনে বেহেশতের চিত্র তুলে ধরা হয়, আয়াতে আল্লাহ বর্ণনা করেন, যে ফলগুলো তুলে নেবার জন্য প্রস্তুত ঃ *"এদের ছায়াময় শাখাগুলো তাদের উপর নুয়ে পড়বে এদের পাকা ফল তুলে নেবার জন্য ঝুলে থাকবে আর তার বৃক্ষছায়া তাদের উপর ঝুঁকে থাকবে এবং তার ফলাদি সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তে থাকবে।" (সূরা ইনসান/দাহর ঃ ১৪)*

নিশ্চয়ই এখানে যা উল্লেখ করা হল তা সীমিত সংখ্যক উদাহরণ। আল্লাহ যে অনুগ্রহ দান করেন, তা এত বিভিন্ন প্রকার যে তা গণনা করা যায় না। যিনি খাবার টেবিলে এটি উপলব্ধি করতে পারেন, তিনি আর একটি আয়াত স্মরণ করেন ঃ

> *তবে যদি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তার মত যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা বিশ্বাস করবে না? যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর। তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরা নাহল ঃ ১৭-১৮)*

কিরূপ স্বাদগন্ধ ও সুরভী একজনকে ভাবায় ঃ

চিন্তা করতে করতে আমরা উপলব্ধি করে থাকি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আরও সৌন্দর্য এবং কৌশল। এগুলো অনুধাবন করে একজন বিবেকবান ব্যক্তি আরও ভাবেন যে এটা প্রভুর তরফ থেকে একটি অনুগ্রহ যে আল্লাহ প্রদত্ত আশীর্বাদ থেকে সে আনন্দ পেতে পারে। তিনি স্মরণ করেন বিশেষভাবে স্বাদ ও গন্ধের অনুভূতি আমাদেরকে এই জগতের বহু সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এবং তিনি ভাবতে থাকেন যে যদি আমাদের গন্ধের অনুভূতি না থাকতো তাহলে আমরা গোলাপ, আমরা যে ফল খাই, অথবা এমনকি বারবেকিউ থেকে যেমন আনন্দ পাই তেমন আনন্দ পেতাম না। যদি আমাদের গন্ধের অনুভূতি না থাকতো আমরা চকলেট, ক্যাণ্ডি, মিছরি, মাংস, ষ্ট্রবেরী এবং অন্যান্য নিয়ামতসমূহের অনুপম স্বাদ চিনতে পারতাম না।

আমরা অবশ্য ভুলবনা যে আমরা বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন পৃথিবীতে ভাল করেই বাস করতে পারতাম এবং যদি আল্লাহ আমাদের এসব আশীর্বাদ না দিতেন আমরা কোনভাবে এটা অর্জন করতে পারতাম না। তথাপি আল্লাহ আমাদের উপর স্বাদ, গন্ধ এবং স্নায়ুতন্ত্র সৃষ্টি করে মানুষের উপর আশীর্বাদ প্রদান করেছেন।

বাগানে পদচারণা কালে ...
প্রকৃতিতে দেখা সৌন্দর্য্য একজনকে কি ভাবায়?

যিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য দেখে তার প্রভুর প্রশংসা করে। আল্লাহ যে বিরাজমান সব সৌন্দর্য্যের নির্মাতা তা তিনি অবগত। তিনি জানেন এই সকল সৌন্দর্য্যসমূহ আল্লাহর এবং এরা তার সৌন্দর্য্যের গুণের প্রকাশ।

প্রকৃতিতে পদচারণার সময়, একজন আরেকজনের চেয়ে আরও বেশি সৌন্দর্য্যের সম্মুখীন হয়। খড় থেকে হলুদ তারাফুল, পাখী থেকে পিপীলিকা, প্রতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা চিত্র যা অনুধ্যানের প্রয়োজন। মানুষ যখন এদের উপর অনুধ্যান করে, তারা আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা বুঝতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ প্রজাপতি অত্যন্ত রুচি-জ্ঞান সম্মতভাবে আনন্দদায়ক প্রাণী। এদের মত ডানার সুষমতা ও ডিজাইন যেগুলো অতিশয় সূক্ষ্ম যেন হাতে আঁকা, তাদের সমুজ্জল অনুপ্রভ বর্ণ, এমন প্রজাপতি আল্লাহর অনুপম শিল্প কর্ম সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টির-ক্ষমতার প্রমাণ।

অনুরূপভাবে পৃথিবীতে অসংখ্য উদ্ভিদ ও বৃক্ষের ভেরাইটিজগুলো আল্লাহর সৃষ্ট সৌন্দর্য্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন বর্ণের ফুল, বিভিন্ন আকারের বৃক্ষ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তারা মানুষকে বিরাট আনন্দ দিয়ে থাকে।

যার বিশ্বাস আছে তিনি চিন্তা করেন ফুল যেমন গোলাপ ভায়োলেট, তারা ফুল, কচুরীপানা, কাবনেশন, অর্কিড এবং অন্যান্য ফুলের এমন মসৃণ উপরিভাগ এবং কেমনে তারা বীজ থেকে সম্পূর্ণরূপে চ্যাপটা হয়ে বের হয়ে আসে কুঞ্চন ছাড়াই যেন ইস্তিরিকৃত।

অন্যান্য আশ্চর্য্য জিনিস যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তা হল ফুলের সুবাস। উদাহরণস্বরূপ গোলাপের থাকে অত্যন্ত প্রবল সর্বদা বিরাজমান চির পরিবর্তনশীল গন্ধ। এমনকি, সম্প্রতিকতম প্রযুক্তি সহকারে ও একজন বিজ্ঞানী একটি গোলাপর প্রকৃত গন্ধে সমকক্ষ সৃষ্টি করতে পারে না। ল্যাবরেটরীতে এরূপ নকল গন্ধ সৃষ্টির গবেষণার ক্ষেত্রে কোন সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না। গোলাপের সেন্টের উপর ভিত্তি করে যে গন্ধ উৎপন্ন হয় তা সাধারণত প্রকট এবং বিরক্তিকর। অবশ্য গোলাপের মূল গন্ধ কিন্তু বিরক্ত লাগে না।

যার বিশ্বাস আছে তিনি জানেন এগুলোর প্রত্যেকটি আল্লাহকে প্রশংসা করতে তৈরি করা হয়েছে, আল্লাহর সৃষ্টির সৌন্দর্যের মধ্যে কলাকৌশল এবং জ্ঞান তাকে উপহার দিতে। এই কারণে যখন মানুষ সৌন্দর্য্য অবলোকন করে বাগানে পদচারণা করতে গিয়ে সেই আল্লাহর গৌরব করে এই বলে "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা-ই হয়ে থাকে, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোন ক্ষমতা নেই।" (সূরা কাহফ ঃ ৩৯)

তিনি স্মরণ করেন যে আল্লাহ মানুষের সেবার জন্য সকল সৌন্দর্য্য রেখে দিয়েছেন এবং তিনি বিশ্বাসীদেরকে পরকালে অতুলনীয় চমৎকার অনুগ্রহ দান করবেন। এবং এর কারণে আল্লাহর প্রতি ভালবাসা আরও বেশি বেড়ে যায়।

বাগানে পদচারনার সময় আপনার দেখা পিপীলিকা সম্বন্ধে ভেবে দেখেছেন কি?

সাধারণত মানুষ চারপাশে দেখা প্রাণীকূল সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে কোনরূপ অনুভূতি দেখায় না। তারা কল্পনাও করেনা যে প্রতি দিন যে প্রাণীকূলের সম্মুখীন হয় তাদের মজার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অপরদিকে, বিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য আল্লাহ প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু পরিপূর্ণ সৃষ্টির চিহ্ন বহন করে। পিপীলিকাও এই প্রাণীরই একটি।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, তিনি বাগানে ভ্রমণের সময় পিপীলিকা দেখে তার প্রতি অন্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। তার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে তিনি আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টিই অবলোকন করেন।

এমনকি পিপীলিকার চলাচল ও চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। এটা তার অতি ক্ষুদ্র পা আনুক্রমিক ও এমন অত্যন্ত সুসংগঠিতভাবে নাড়ায় যে সে জানে নিখুঁতভাবে কোন্ পাটি সর্বপ্রথম ও কোন্‌টি পাটি পরবর্তী ধাপে ফেলতে হবে। সে দ্বিধাহীনভাবে দ্রুত চলাচল করে।

এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ তার দেহের চেয়ে বড় খাদ্যকণা বহন করে। সে প্রাণপনে তার বাসায় এটা বহন করে নিয়ে যায়। সে তার ক্ষুদ্র দেহের তুলনায় তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করে। বিশিষ্টতাহীন জমিতে সে তার সেবায় নিয়োজিত কোন গাইড ছাড়াই সহজে তার বাসা খুঁজে দিতে পারে। বাসার প্রবেশ পথ আমাদের জন্য খুঁজে পেতে ক্ষুদ্র দুষ্কর হলেও তার জন্য বিভ্রান্তিকর হয়না, এবং যেখানেই থাকুন না কেন, খুঁজে পায়। যখন কেউ বাগানে এই পীপিলিকাগুলো প্রত্যক্ষ করেন, একজনের পর আরেকজন সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে বাসায় খাদ্য বহনের জন্য গভীর আগ্রহের সাথে পরিশ্রম করছে, একজন আশ্চর্য্য না হয়ে থাকতে পারে না, কেন এই ক্ষুদ্র প্রাণীকূলের এ কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে কী উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তখন একজন উপলব্ধি করেন যে পীপিলিকা কেবল নিজের জন্য নয়, তার কলোনীর অন্যান্য সদস্য, রাণী ও শিক্ষকদের জন্য খাদ্য বহন করে থাকে। কেমনে এই ক্ষুদ্র প্রাণী, যার এমনকি উন্নত মগজ নেই, সে জানে অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, এবং আত্মত্যাগ একটি বিষয় যার উপর একজনের অনুধ্যান করা উচিত। এই সত্যসমূহ চিন্তা-ভাবনা করে একজন নিম্নলিখিত উপসংহারে পৌছান ঃ পিপীলিকা অন্যান্য প্রাণীকূলের ন্যায় আল্লাহরই অনুপ্রেরণায় কাজ করে এবং একাই তাঁর আদেশ পালন করে।

আইভি এর সচেতন নড়াচড়া একজনকে কী ভাবায় ঃ

একজন বিশ্বাসী বাগানে পদচারণার সময় যে আইভির সম্মুখীন হয়, তার সম্বন্ধে চিন্তা করে, যা আল্লাহ যে সব সুন্দর জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে একটি। যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে প্রতিটি প্রাণী যে নিদর্শন আছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি শাখার অথবা বস্তুর চারদিকে আইভি যে কুণ্ডুলী পাকায় তা একটি ঘটনা যার সম্বন্ধে একজন সতর্কভাবে ভাবা প্রয়োজন। যদি আইভির বৃদ্ধি রেকর্ড

আইভি লতার একটি বস্তুর চারিদিকে প্যাঁচানো একটি সচেতন প্রাণীর নড়াচড়ার মত দেখায়।

করা হত এবং তারপর replay দ্রুত গতিশীল করা হত, দেখা যেত যে, আইভি সচেতন প্রাণীর মতই চলাচল করছে। ঠিক যেমন এটা তার সামনে একটি শাখা দেখতে পায়, ঐ শাখার দিকে সে অগ্রসর হয়, এবং শাখার সাথে নিজকে বেধে ফেলে, যেন সে ফাঁস দড়ি দিয়ে ধরে ফেলছে। কখনও কখনও অনেকবার শাখাটি ঘিরে ধরে নিজের নিরাপত্তার জন্য। এইভাবে এটা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যখন এর পথ শেষ হয়ে আসে তখন, নতুন পথ সৃষ্টি করে প্রত্যাবর্তন করে অথবা নিচের দিকে অগ্রসর হয়ে নতুন গতিপথ তৈরি করে। একজন বিশ্বাসী যখন এসব প্রত্যক্ষ করেন পুনরায় দেখতে পান আল্লাহ সকল প্রাণীকূল অনুরূপ নিখুঁত পদ্ধতিসহকারে সৃষ্টি করেছেন।

যখন একজন আইভি-এর চলন পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন, তিনি গাছটির অপর পার্শ্বে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখতে পান। তিনি দেখেন আইভি যার উপর অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে তার উপরিভাগ সংলগ্ন হয় বাহুসমূহ পার্শ্ব বরাবর প্রসারিত করে। এই "অচেতন" উদ্ভিদ যে আঠালো বস্তু উৎপন্ন করে তা এত শক্ত যে যখন কেউ একে বিচ্ছিন্ন করতে চেষ্টা করে, দেওয়ালের পেইন্ট তোলে ফেলবে। এমন গাছের অস্তিত্ব একজন বিশ্বাসী যিনি দেখেন ও তার উপর অনুধ্যান করেন তার কাছে প্রকাশ হয় আল্লাহর সর্বময় ক্ষমতা, যিনি (আল্লাহ) এই গাছের স্রষ্টা।

বৃক্ষসমূহ একজনকে কি ভাবায়?

আমরা প্রতিদিন ও প্রতি স্থানে বৃক্ষ দেখতে পাই। যাহোক আপনি কখনও কি ভেবে দেখেছেন কিভাবে পানি বৃক্ষের উপর শাখায় দূরতম পাতাটিতে কিভাবে পৌছে? আমরা

তুলনার মাধ্যমে এই অসাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে অধিকতরভাবে বুঝতে পারি। আপনার অট্টালিকার মাটির নিচের তলার টাংক থেকে জলের শব্দ তরঙ্গ যন্ত্র অথবা অন্য কোন শক্তিশালী ইঞ্জিন ছাড়া উপরের তলায় উঠানো অসম্ভব। আপনি এমনকি প্রথম তলা পর্যন্ত পাম্প করে পারবেন না।

অতএব বৃক্ষেও হাইড্রোফোণিক ইঞ্জিনের মত পার্ম্পিং পদ্ধতি আছে। অন্যথায়, যেহেতু পানি বৃক্ষের কাণ্ডে শাখা-প্রশাখায় পৌছতে না পারে, বৃক্ষ শীঘ্র মরে যেত।

আল্লাহ প্রতিটি বৃক্ষকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সহকারে সজ্জিত করে সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি তুলনামূলকভাবে বৃক্ষের হাইড্রোলিক পদ্ধতি আমরা যে দালানে বাস করি তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রেষ্ঠ।

সেটি বিষয়সমূহের মধ্যে একটি, যিনি "একটি চক্ষু যা সত্যিকারভাবে দেখেন," সব কিছু অবলোকন করেন, তিনি এই গাছগুলি দেখে চিন্তা করেন।

আর একটি বিষয় যা পাতার সম্পর্কে আলোচিত। যে ব্যক্তি যিনি যা তিনি দেখেননি, গাছের প্রতি তাকিয়ে তিনি পাতাকে সাধারণ আকৃতির বিবেচনা করেন, যার প্রতি তিনি অভ্যস্ত। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের চিন্তা করেন যা বেশির ভাগ লোকের নিকট কোন ঘটনাই নয়। উদাহরণস্বরূপ পাতা খুবই কোমল অঙ্গ। তথাপি তারা প্রখর তাপে শুকিয়ে যায় না। যখন একজন মানুষ ৪০°C তাপমাত্রায় মাত্র কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করে, তার চর্মের বর্ণ বদলে যায় এবং পানি শূন্যতায় ভোগে। অপরদিকে গাছের পাতা দহনশীল তাপেও সবুজ থাকে, দিনের পর দিন এমনকি মাসের পর মাস। যদিও তাদের সূতার মত শিরা দিয়ে সামান্য পানি নির্গত হয়। এটা সৃষ্টির অলৌকিকত্ব যা আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান দিয়ে প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন তাই প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি বিশ্বাসী, এসব অলৌকিকত্বের উপর চিন্তা করে পুনরায় দেখতে পান আল্লাহর ক্ষমতা এবং তাঁকে স্মরণ করেন।

পত্রিকা পড়া অথবা টিভি দেখার সময়

মানুষ দৈনিক পত্রিকা অথবা টিভি সংবাদ দিনের বেলা অথবা সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখে থাকেন। এই সব সংবাদে বিবেকবান লোকদের চিন্তা করা, অনুধাবন করার ঘটনা থাকে এবং যাতে আল্লাহর নিদর্শানাবলি দেখতে পাওয়া যায়।

সহিংসতা, ডাকাতি ও নরহত্যা ঘটনাজনিত পুনঃপুন ঘটা একজনকে কী ভাবায়?

একজন প্রতিদিন পত্রিকার স্থানীয় সংবাদের পাতায় অথবা টিভি সংবাদে, নরহত্যা, আহত করা, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা এবং আত্মহত্যার বহু সংবাদের মুখোমুখি হয়। এই সকল ঘটনাবলি ঘনঘন ঘটার এবং বিপুল সংখ্যক লোকের এরূপ অপরাধ করতে প্রবৃত্ত হওয়া নির্দেশ করে যে যারা ধর্ম নিয়া জীবন চালান না তারা আল্লাহর শাস্তি ভোগ করে।

যে সমাজে আল্লাহকে ভয় করা হয় সেখানে এ ধরনের কোন দৃশ্যই দেখা যায় না।

মুক্তিপণের জন্য কারও ছোট শিশু অপহরণ করে তাকে ভয়ানক ভয়ে ফেলা, একজনের সম্মুখে বন্দুক উচানো এবং বিনাদ্বিধায় গুলি করা, আরেকজনের ঘুষ গ্রহণ, অথবা আত্মহত্যা করা অথবা প্রতারণা ... এই সকল হল যে মানুষ আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করেন। তারই আলামত। যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে এবং জানে যে পরকালে তাকে হিসাব দিতে হবে সে এগুলোর কিছুই করবে না। এসব কাজের প্রতিটি দোযখের সাথে প্রতিস্থাপন করা হবে, যদি এগুলো থেকে অনুতপ্ত হয়ে ফিরে না আসে এবং যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন ও দয়া না দেখান।

কেউ বলতে পারেন, "আমি নাস্তিক, আমি আল্লাহ বিশ্বাস করি না, তথাপি আমি ঘুষ খাই না।" যাহোক, আল্লাহকে ভয় না করে এক ব্যক্তির এরূপ বক্তব্য মোটেই বিশ্বাস জন্মায় না। এটা খুবই সম্ভব যে যদি অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তিনি এই প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করবেন। উদাহরণস্বরূপ যদি এই ব্যক্তি কোন জরুরি কারণে টাকা পেতে হয় এবং এরূপ অবস্থার মধ্যে পতিত হয় যাতে তার চুরি করা অথবা ঘুষ গ্রহণের তার সুযোগ আছে তিনি প্রতিজ্ঞা নাও রাখতে পারেন অথবা এরূপ ব্যক্তি যখন তার জীবন বিপন্ন হয় তখন তার কথা নাও রাখতে পারেন। যদিও এই ব্যক্তি কঠিন অবস্থায়ও ঘুষ এড়াতে পারেন, তিনি অন্যান্য নিষিদ্ধ কাজ করতে প্রবণতা দেখাতে পারেন। যাহোক, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, এমন কিছুই করেন না যার জন্য তার পরকালে হিসাব দিতে পারবেন না।

সুতরাং ঘটনাবলির কারণসমূহ যা সংবাদে, টিভিতে, আমাদের সামাজিক জীবনে বলে থাকি আমাদের চীৎকার করে বলতে উত্তেজিত করে, "এ সমাজের কী হল?" তা সত্যিকারভাবে, ধর্মের ঘাটতি। একজন বিশ্বাসী যে এই রিপোর্ট দেখে এদের প্রতি অন্ধের মত তাকায়না এবং ভাবে একমাত্র সমাধান হল মানুষকে ধর্মের জন্য বলা এবং ধর্মের মূল্যবোধ পুনর্জাগরিত করা। আল্লাহকে ভয় করে এরূপ লোকদের এবং যারা

জানে পরকালে তাদের জবাবদিহী করতে হবে, তাদের নিয়ে গঠিত সমাজে এই প্রকার ঘটনা যা এরূপ মাত্রার ঘটনা তা ঘটা অসম্ভব। এরূপ একটি সমাজে শান্তি এবং নিরাপত্তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিরাজ করে।

সকাল পর্যন্ত চলা আলোচনা কর্মসূচি আমাদের কী ভাবায়?

যে ব্যক্তি তার চারি পার্শ্বে যে বিষয় তিনি দেখে তার উপর ভাবেন, টিভিতে প্রচারিত আলোচনা অনুষ্ঠান, তার জন্য সম্বন্ধে চিন্তা করা তার আর একটি উদাহরণ।

যে সকল লোক দিনের ঘটনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত এবং যারা বিষয়টির সঙ্গে খুব বেশি জানেন তারাই এই আলোচনা প্রোগ্রামের অন্তর্ভূক্ত। এই সকল লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয়টির উপর আলোচনা করেন কিন্তু কেউ সমাধান দিতে অর্থাৎ উপসংহারে পৌছতে পারেন না। যাহোক, যারা এরূপ আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন তারা হলেন এমন ব্যক্তি তারা এই সমস্যাগুলোর সমাধানের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত।

বেশির ভাগ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্পূর্ণ পরিষ্কার বটে। যাহোক মানুষের আত্মস্বার্থ, তাদের প্রত্যক্ষ চক্রের প্রভাবে থাকা, তাদের আন্তরিকভাবে কোন সমাধানে না চাওয়ার চেয়ে নিজেদেরকে সামনে তুলে ধরা, তাদের অচলাবস্থা আনয়ন করে।

একজন বিবেকবান ব্যক্তি যিনি এসব প্রত্যক্ষ করেন, তিনি ভাবেন সমাজে আল্লাহ ধর্মে থেকে দূরে থাকাই এসব ঘটনাবলির কারণ। যে ব্যক্তি আল্লাহ বিশ্বাস করেন তিনি কখনও দায়িত্বহীন, নিষ্ফলা ও বেখেয়াল মনোভাব দেখান না। তিনি জানেন, আল্লাহ তাকে যে প্রতিটি ঘটনার মুখোমুখী করেন তাতে মঙ্গল আছে এবং পৃথিবীতে তাকে অবিরত পরীক্ষা করা হচ্ছে, তার যুক্তি শক্তি এবং জ্ঞান এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে আল্লাহ খুশী হন।

তদুপরি যখন একজন বিশ্বাসী এই কর্মানুষ্ঠান দেখেন তিনি আল্লাহর একটি আয়াত স্মরণ করেন ঃ

মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারেই কলহপ্রিয়। (সূরা কাহফ ঃ ৫৪)

এই সকল অনুষ্ঠানের পরিবেশ মানুষের তর্কপ্রিয়তা ও বাদানুবাদ করার প্রকৃতি প্রকাশ করে দেয়। মানুষের বেশির ভাগ সময় এমনকি প্রশ্ন বুঝার ব্যর্থতা, তারা যা বলবে তার দ্বারা বদ্ধ সংস্কার আবিষ্ট থাকা এবং সবার আগে বলার চেষ্টা, তাদের একজন আরেকজনকে বাধা দান, সহজেই তাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করা এবং মুহূর্তে তাদের মেজাজ হারানো এবং তাদের একের প্রতি আরেকজনে অসম্মান দেখানো, এগুলো পরিষ্কারভাবে বাহ্যতঃ শিক্ষিত ও পরিশীলিত লোক যাদের আল্লাহর ধর্মজ্ঞান কম, পরস্পর নেতিবাচক দিক প্রকাশ করে দেয়।

শতকরা একশত ভাগ আন্তরিক সৎ ব্যক্তির দল যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে এরূপ দীর্ঘ সময়ব্যাপী এবং নিস্ফল দৃশ্য কখনও ঘটেনা। যেহেতু উদ্দেশ্য

হল সমাধান, যা আল্লাহকে সবচেয়ে সন্তুষ্ট করে এবং মানুষের সবচেয়ে বেশি কাজের, যুক্তির সবচেয়ে সমুচিত ও বিজ্ঞ পদ্ধতি পাওয়া, সময় ক্ষেপন না করে তা কাজে প্রয়োগ করা। যেহেতু প্রত্যেকের বিবেক চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে সন্তোষ লাভ করবে, সুতরাং কোন বাদানুবাদ ঘটবে না।

যদি কারও কোন আপত্তি থাকে, যা সঙ্গত কারণের উপর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যা আরও ভাল পথ দেখায় তখন তার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়। যারা অন্যান্য মতের নয়, আল্লাহ ভয় করে, তারা কখনও একগুয়ে ও উদ্ধত মনোভাব দেখায় না, আল্লাহ কোরআনে কি বলেন, তা স্মরণ করে .... *"প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর আছে এক মহাজ্ঞানী।" (সূরা ইউসুফ ঃ ৭৬)* তারা সবচেয়ে যা পারেন সেই অধিকার (পছন্দ করার) দিয়ে থাকবে।

এসব আলোচনা যা কোন সমাধান ছাড়াই সকাল না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে তা বিবেচনার মূল্য রাখে, কারণ তারা দেখান একটি পরিবেশ যেখানে মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চরিত্রের উন্নত গুণাবলি টিকে থাকে না সেখানে কি ঘটতে পারে।

পৃথিবীর প্রতি কোণায় দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য একজনকে কী ভাবায়?

প্রচার মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়সমূহের মধ্যে একটি বিষয় ঘনঘন আলোচিত হয় তা হল মানুষের মধ্যে অধিকার।

যেখানে পৃথিবীর একদিকে উল্লেখযোগ্য উন্নত দেশ তাদের আছে উঁচু স্তরের কল্যাণ, সেখানে অপর দিকে আছে এমন লোকে যারা কোন কিছু খেতে পায় না, অতি সাধারণ রোগেও যাদের চিকিৎসা করার মত ওষুধ নেই এবং যারা বারবার অবহেলার কারণে মারা যায়। সর্বাগ্রে যে জিনিস প্রকাশ করে তা হল পৃথিবীতে প্রবলভাবে বিরাজমান দুর্বৃত্তাধম পদ্ধতি। এক বা একাধিক সম্পদশালী দেশের পক্ষে ঐ সকল লোকদের বাঁচানো খুবই সহজ। উদাহরণস্বরূপ আফ্রিকায় ক্ষুধায় মারা যাচ্ছে এরূপ জাতির নিকটেই আছে এমন সম্প্রদায় যারা হীরক খনি থেকে সম্পদ জমা করে রাখছে এবং তা থেকে উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে। যদিও যেসব লোক দারিদ্র্যে বসবাস করে, প্রায় অনাহারে থাকে মৃত্যুর জন্য পরিত্যক্ত হয় ও তাদের যুগযুগ ধরে মৌলিক সমাধান চাওয়া হচ্ছে না, তাদের নতুন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা, তাদের চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় উপায় সরবরাহ করা সহজ।

যাহোক, এসব লোকের সাহায্য করার কাজটি এমন নয় যে সামান্য কয়েকজন এটা চালাতে পারে। এটার মৌলিক সমাধান বের করার মত বহু লোকের আত্মত্যাগের প্রয়োজন আছে। যাহোক, আজকাল, এরূপ সমাধান করার মত দাবীদার তেমন লোকের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

পৃথিবীর প্রতি অঞ্চলে ট্রিলিয়ন, ট্রিলিয়ন ডলার বিভিন্ন কারণে অপচয় হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে, যে কিছু লোক লবণ সঠিক পরিমাপের অভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে খাদ্য ফেলে দেয় এবং অন্যদিকে কিছু লোক পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে মারা যায় এগুলো পৃথিবীর অন্যায়

বিন্যাসের কারণ যা পৃথিবীতে ধর্মীয় মূল্যবোধে অনুসরণ ব্যতীত জীবনযাপন করার কারণে ঘটে থাকে তা পরিষ্কার প্রমাণ।

যে ব্যক্তি এসব দেখেন তিনি চিন্তা করেন একমাত্র জিনিস যে পাপাচার নির্মূল করবে তা হল আল্লাহ যে মূল্যবোধের আদেশ করেন তা গ্রহণ করা। যে সব লোক আল্লাহকে ভয় করে এবং বিবেক অনুযায়ী কাজ করে তারা কখনও এরূপ পাপাচার ও অবিচার ন্যায্য বলে স্বীকার করবে না। তারা অভাবগ্রস্থ লোকদেরকে দ্রুত নির্দিষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে, কোন প্রশংসা অনুমোদন না করে, যদি প্রয়োজন হয় পৃথিবীর সকল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সাহায্য করবে।

আল্লাহ কোরআনে বলেন যে দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থকে সহায়তা করা ঐ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্য যারা আল্লাহ এবং বিচার দিবসকে ভয় করে। তাদের সম্বন্ধে হক নির্ধারিত আছে প্রার্থী ও অপ্রার্থী নির্বিশেষে সকলের জন্য আর তারা কিয়ামতের দিনকে সত্য বিশ্বাস করে আর তারা তাদের রবের আযাব সম্পর্ক ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরা মা'রিজ ঃ ২৪-২৭)

আর তারা আল্লাহর মহব্বতে খাদ্য দান করে মিসকীন, ইয়াতিম ও বন্দীকে ঃ তারা বলে ঃ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তোমাদেরকে খাদ্য দান করছি, আমরা তোমাদের কাছে এর জন্য কোন বিনিময় চাই না এবং কোন কৃতজ্ঞতাও না। আমরা আমাদের রবের তরফ থেকে এক ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ দিনের আশঙ্কা করি। (সূরা আল ইনসান/দাহর ঃ ৮-১০)

গরিবকে খাদ্য দান না করা অধার্মিক লোকের বৈশিষ্ট্য যাদের আল্লাহ ভীতি নেই।

ফেরেশতাদেরকে বলা হবে ঃ একে ধর, এর গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। তারপর তাকে দোযখে প্রবেশ করাও অতঃপর তাকে এমন এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর যা সত্তর গজ দীর্ঘ। সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখত না এবং উৎসাহিত করত না মিসকিনদেরকে আহার্য্য প্রদানে; অতএব আজকের দিনে এখানে তার কোন অন্তরঙ্গ সহায় নেই; এবং কোন খাদ্য নেই ক্ষত-বিধৌত পানি ছাড়া যা গুনাহগার ব্যতিরেকে কেউ খাবেনা।

(সূরা হাক্কা ঃ ৩০-৩৭)

তারা কি দেখে না যে
তারা প্রতি বছর একবার
কি দু'বার বিপদগ্রস্থ হয়?
তবুও তারা তওবা করে
না এবং উপদেশ গ্রহণ
করেনা।
(সূরা তওবা ঃ ১২৬)

পৃথিবীর সর্বত্র সংঘটিত দুর্যোগ মানুষকে কি ভাবায়?

টিভি ও সংবাদপত্রে কোন কোন সংবাদ যা মানুষ ঘন ঘন মোকাবেলা করে তা হল দুর্যোগ। মানুষ যে কোন সময় এই দুর্যোগের মোকাবেলা করতে পারে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প সংঘটিত হতে পারে, অগ্ন্যুৎপাত শুরু হতে পারে অথবা বন্যা সংঘটিত হতে পারে। যারা এই সংবাদগুলো দেখেন তারা স্মরণ করে যে আল্লাহ সকল কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন, তিনি যদি ইচ্ছা করেন একটি শহরকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারেন। এগুলো চিন্তা করে একজন দেখতে পায়, আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই যার আশ্রয় নেওয়া যায় এবং যার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া যায়। এমনকি সবচেয়ে শক্তিশালী দালান এবং শহর অত্যন্ত উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা সজ্জিত আল্লাহর শক্তির বিরুদ্ধে টিকতে পারেনা, তারা অকস্মাৎ ধ্বংস হতে পারে।

এসব দৃশ্যাবলি ঐসব মানুষের জন্য যারা চিন্তা করে ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

যে ব্যক্তি এইসম্বন্ধে শুনে, অথবা দুর্যোগ রিপোর্ট পড়ে, তারা আরও অনুধ্যান করে যে আল্লাহ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে একটি শহরের বিরুদ্ধে দুর্যোগ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ কোরআনে বর্ণনা করেন তিনি অবাধ্য জাতিকে শাস্তি বরাদ্দ করেন যাতে তারা অনুধাবন করে অথবা তাদের কর্মের জন্যে প্রতিফল প্রদান করা হয়। এই কারণে যদি কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায় এমন কিছু মূল্যবোধ অনুশীলন করে যার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট আল্লাহ তার কারণে শাস্তি দিতে পারেন। অথবা এমন হতে পারে আল্লাহ এসব লোকদের এই পৃথিবীতে কিছু কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করছেন।

এই সকল সম্ভাবনা চিন্তা করে বিশ্বাসীরা ভয় করে যে এসব তাদের উপর পতিত হতে পারে এবং নিজের আচরণের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

কোন ব্যক্তি কোন জাতি কোন দুর্যোগ সংঘটিত হতে বাধা দিতে পারেনা যদি আল্লাহ তদ্রূপ ইচ্ছা না করেন। এটা সবচেয়ে ধনী এবং শক্তিশালী দেশ অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য খুব সামান্য ঝুঁকিপূর্ণ স্থান, তাতে কোন পার্থক্য থাকে না।

> *... আল্লাহ বলেন যে কোন জাতি তাদের উপর আপতিত কোন দুর্যোগ রুখতে পারে না তবে কি জনপদবাসী নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে এ থেকে যে, আমার শাস্তি তাদের উপর আসতে পারে রাত্রিকালে যখন নিদ্রামগ্ন থাকবে? অথবা জনপদবাসী কি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আমার আযাব তাদের উপর দিন-দুপুরেও এসে পড়তে পারে যখন তারা খেলাধূলায় মত্ত থাকবে? তারা কি আল্লাহর পাকরাও সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? আল্লাহর পাকরাও সম্বন্ধে কেউ নিশ্চিন্ত হতে পারে না, তাদের ছাড়া যারা ক্ষতিগ্রস্থ। একথা কি পরিষ্কার হয়নি তাদের কাছে যারা উত্তরাধিকারী হয়েছে পৃথিবীর সেখানকার অধিবাসীদের ধ্বংসের পরে যে, আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে তাদের পাপের দরুণ তাদেরকেও বিপদগ্রস্থ করতাম? আর আমি মোহর মেরে দেব তাদের অন্তরে ফলে তারা শুনতে পাবে না। (সূরা আ'রাফ ঃ ৯৭-১০০)*

সুদ সম্পর্কিত সংবাদ একজনকে কী ভাবায়?

আরেকটি বিষয়বস্তু যা ঘন ঘন সংবাদে আলোচিত হয় তা হলো অর্থনীতিতে পতন। বিশেষভাবে প্রতিদিন সুদ সম্পর্কে বেশ কিছু নেতিবাচক তথ্যাবলি রিপোর্ট করা হয়। কেউ সুদ নিয়ন্ত্রণের বাইরে এরূপ উল্লেখপূর্বক রিপোর্ট পড়ে থাকেন এবং তা অর্থনীতি মন্দাভাব সৃষ্টি করে উপলব্ধি করেন যে এরূপ গভীর এবং নিষিদ্ধ কাজের ব্যাপকভাবে গ্রহণের জন্য আল্লাহ মানুষের আয়ের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেন। যেমন আয়াতে বলা হয়েছে ঃ *আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে পছন্দ করেন না। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৬)*

আল্লাহ সুদের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাকে নির্মূল করেন এবং এর উপাদনশীলতা কমিয়ে দেন। এই সত্য অন্য একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে এবং তা নিম্নরূপ ঃ

> *"মানুষের ধন-সম্পদ তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় যা কিছু তোমরা সুদে দিয়ে থাক, আল্লাহর কাছে তা বর্ধিত হয়না। পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা কিছু তোমরা যাকাতরূপে দিয়ে থাক তবে এরূপ লোকেরাই (তাদের প্রদত্ত বস্তুকে) আল্লাহর জমীনে বর্ধিত করতে থাকবে।*
>
> *(সূরা রূম ঃ ৩৯)*

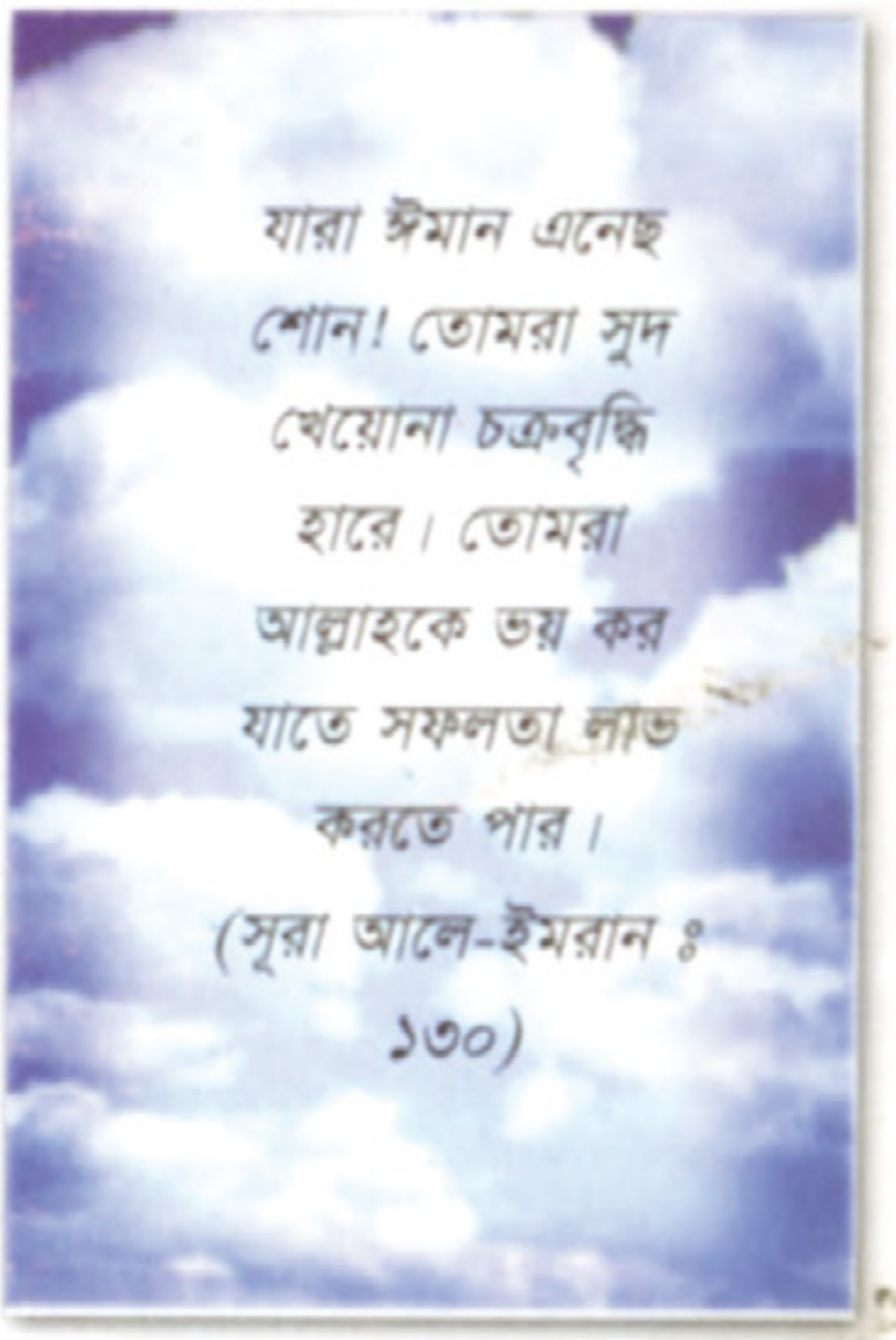

একজন অনুধ্যানকারী ব্যক্তির জন্য, সুদ সম্পর্কিত রিপোর্টও হল উদাহরণস্বরূপ যা আল্লাহর আয়াত মানুষের মাঝে প্রকাশিত হয়।

মনোরম স্থান সম্বন্ধে চিন্তা করা

টিভি প্রোগ্রাম, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে আল্লাহ সৃষ্ট সৌন্দর্য্য দেখা এবং এর উপর অনুধ্যান করা সম্ভব। কোথাও আশ্চর্য্য দৃশ্য, সুন্দর ভবন, বাগান অথবা সমুদ্র তীর দেখা ও পরিদর্শন করা নিশ্চয়ই প্রত্যেককে আনন্দ দান করে। সর্বাগ্রে এই সব দৃশ্যাবলি একজনকে বেহেশতের কথা মনে করিয়ে দেয়। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি আরও একবার আল্লাহকে স্মরণ করে, যিনি এরূপ বিরাট নিয়ামত দান করেন এবং মানুষকে এরূপ গৌরবান্বিত সৌন্দর্য্য দেখান নিশ্চয়ই তিনি বেহেশতে অতুলনীয় স্থান তৈরি করবেন।

যে কেউ এসব দেখে সে চিন্তা করে যা নিম্নরূপ ঃ

পৃথিবীতে সৃষ্ট সকল সৌন্দর্য্যে কিছু সংখ্যক ত্রুটি ও অপূর্ণতা থাকে কারণ পৃথিবী একটি পরীক্ষার স্থান। যে ব্যক্তি একটি ছুটি কাটানোর স্থানে কিছু সময় কাটায়, তিনি যে সবের ছবি টিভিতে দেখেছেন তিনি এর ত্রুটি লক্ষ্য করে থাকেন। আবহাওয়ার সর্বোচ্চ আর্দ্রতা, সমুদ্রের বিরক্তিকর করা লবনাক্ত বস্তু ফোসকা উঠানো তাপ এবং মাছি, এগুলো সামান্য কয়েকটি উদাহরণ। বহু পার্থিব অসুবিধা ঘটতে পারে—যেমন রোদে পোড়া, ট্রাভেল এজেন্সির প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা এবং মানুষের অসহনীয় প্রকৃতি যার সাথে একজনের ভাগাভাগি করে থাকতে হয়।

বেহেশতে এই সৌন্দর্য্যসমূহের আসলসমূহ থাকবে এবং সেখানে এমন একটিও থাকবে না যা বিরক্ত আনয়ন করবে, একটিও অসন্তোষজনক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবেন না। একজন বিশ্বাসী যিনি পৃথিবীতে প্রতিটি সৌন্দর্য্য দেখেন তিনি বেহেশতের আকাংখা করেন। তিনি সর্বদা আল্লাহকে কৃতজ্ঞতা জানান ঐ সকল নিয়ামত যা তাকে পৃথিবীতে দেওয়া হয়েছে এবং এই চিন্তা করে তিনি আনন্দ পান যে আল্লাহ দয়াপরবশ হয়ে এই সকল অনুগ্রহ তাকে দান করেছেন। এই সকল সুন্দর জিনিসের আসল বেহেশতে থাকে। এটা জেনে তিনি পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ভেসে গিয়ে পরকালকে ভুলে যান না। তিনি এমন জীবন পরিচালনা করেন যাতে তিনি চিরন্তন সৌন্দর্য্য পেতে পারেন এবং আল্লাহর বেহেশতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন।

পরমাণু হল বস্তুর নির্মাণ খণ্ড ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত এটা পাঠ একজনকে কি ভাবায়?

মানুষ যদি তার জানা জিনিস সম্পর্কে না ভাবে তিনি তাদের ভেতর কৌশল ধরতে পারেন না এবং কি এক অসাধারণ পরিবেশে তিনি বাস করেন। এ কারণে একজন ব্যক্তি যিনি বিশ্বাসী সর্বদা জীব সম্পর্কে ভাবেন এবং আল্লাহর সৃষ্ট ঘটনাবলি এ সব বিষয় বহু লোকের জানা থাকে, তথাপি তিনি অন্যদের থেকে আলাদা উপসংহার টানতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, এটা সর্বজনবিদিত সত্য যে বিশ্বে প্রতিটি জীব বা জড়বস্তুর মৌলিক উপাদান হল পরমাণু। অর্থাৎ বেশির ভাগ লোক জানে যে বই তিনি পড়েন, যে চেয়ারে তিনি বসে যে পানি তারা পান করে এবং সব জিনিস যা তাদের চারপাশে দেখে থাকেন তারা পরমাণু দ্বারা গঠিত। তবে বিবেকবান ব্যক্তি তার পশ্চাতেও ভেবে থাকেন এবং আল্লাহর মহিমান্বিত শক্তি প্রত্যক্ষ করেন।

যখন মানুষ এই বিষয়সমূহে রিপোর্ট দেখেন, তারা নিম্নরূপ ভাবেন ঃ পরমাণু নির্জীব বস্তু। তাহলে কিভাবে একটা নির্জীব বস্তু যেমন পরমাণু একত্রে আসে এবং সজীব মানুষ গঠন করে, যে দেখতে, শুনতে, কি শুনে তা ব্যাখ্যা করতে, সংগীত যা শুনে উপভোগ করে, চিন্তা করে, সিদ্ধান্ত নিতে, সুখী অথবা দুর্দশাগ্রস্থ হতে সক্ষম। মানুষ কিভাবে এমন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা অন্যান্য পরমাণুর পিণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা?

আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে, আপনার ঘড়ি, যে খাদ্য আপনি ভক্ষণ করেন, যে ভবনে আপনি বাস করেন, আপনার গাড়ি, আপনার গ্লাস, আপনার প্রিয় বস্তু, আপনার বাগানের ফুল, আপনার কম্পিউটার, সাগর, আকাশ এবং আপনার দেহের নির্মাণ খণ্ড একই প্রকার পরমাণু নিয়ে গঠিত?

নিশ্চয়ই নির্জীব ও অসচেতন পরমাণু মানুষকে এই মানবীয় গুণ প্রদান করতে পারেনা। এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ মানুষকে এমন গুণাবলিবিশিষ্ট আত্মা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এটা আল্লাহর একটি আয়াতের কথা স্মরণ করায় ঃ

যিনি অতি সুন্দর করে তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সৃজন করেছেন এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাঁদামাটি দিয়ে, তারপর তার বংশধরকে সৃষ্টি করেন নগণ্য পানির নির্যাস থেকে।

অতঃপর তিনি তাকে সুঠাম করেন এবং তাতে নিজের তরফ থেকে রুহ ফুঁকে দেন, আর তোমাদেরকে দান করেন কর্ণ, চক্ষু ও অন্তকরণ। কিন্তু তোমরা খুব কমই শোকর কর। (সূরা সাজদা ঃ ৭-৯)

গভীর ভাবনার মাধ্যমে একজন কতগুলো সত্যের নাগাল পায়

কখনও তুমি ভেবেছ কি যে কেবল মানুষের জন্যই সব কিছু সৃষ্টি করা হয়েছে? যখন একজন আল্লাহ বিশ্বাসী বিভিন্ন ব্যবস্থাসমূহ এবং বিশ্বে বর্তমান সকল জীব ও নির্জীব বস্তু সতর্ক চক্ষু দিয়ে অনুসন্ধান করেন তিনি দেখতে পান সব কিছু মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি বুঝে থাকেন কোন কিছুই দৈবৎ আবির্ভূত হয়নি বরং আল্লাহই মানুষের ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত যথাযথ ভাবে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ মানুষ বিনাশ্রমে সব সময় শ্বাস নিতে পারে। যে বাতাস গ্রহণ করে তা তার নাসিকা পথ পোড়ায় না, না তার মাথা ঘোরা মাথা ব্যথায় কারণ ঘটায়। বাতাসে গ্যাসের পরিমাণগত অনুপাত এমন পরিমাণে ডিজাইন করা হয়েছে যে যা মানবদেহের জন্য খুবই উপযোগী। যে ব্যক্তি এগুলো চিন্তা করে সে আর একটি চূড়ান্ত বিষয়ের স্মরণ করে ঃ যদি বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ঘনত্ব বর্তমান এর তুলনা কিছু বেশি অথবা কম হত, উভয় ক্ষেত্রে প্রাণী বিলুপ্ত হত। তিনি তখন স্মরণ করেন বাতাসহীন স্থানে তার শ্বাস নেওয়া কত কঠিন। একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি যেমন এই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন, তিনি অবিরত তার প্রভুকে ধন্যবাদ জানান। এ কারণে তিনি দেখেন যে পৃথিবীর আবহাওয়া এমনভাবে অন্যান্য প্রকারে ডিজাইন করা যদি হত, যাতে শ্বাসগ্রহণ কঠিন হত। তথাপি এটা তদ্রুপ নয় এবং পৃথিবীর আবহাওয়া পরিপূর্ণ ভারসাম্যেরও শৃঙ্খলার সাথে সৃষ্টি করেছেন যাতে বিলিয়ন বিলিয়ন লোক অনায়াসে শ্বাস নিতে পারেন।

যে গ্রহের উপর আমরা বসবাস করছি তার সম্বন্ধে কেউ চিন্তা করেন, পানি আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন মানব জীবনের জন্য তা কত গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত বিষয় মনে আসে ঃ মানুষ সাধারণত যখন পানি থেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বঞ্চিত হয় তখনই তার গুরুত্ব উপলব্ধি করে থাকে। যাহোক পানি এমন একটি বস্তু যা আমরা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেহ কোষের এক বিরাট অংশ এবং রক্ত যা আমাদের দেহের প্রতিটি পয়েন্টে পৌছে থাকে তা পানি দিয়ে গঠিত। এরূপ যদি না হত, রক্তের জলীয় পদার্থ কমে যেত এবং শিরায় এর প্রবাহ কঠিন হয়ে যেত। পানির তারল্য কেবল আমাদের দেহের জন্য নয় বরং উদ্ভিদেরও জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এরূপে পানি তার

সূত্রাকার নালিকার ভেতর দিয়ে পাতার দূরতম প্রান্তে পৌছে বেশ পরিমাণ পানি আমাদের পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য করেছে। পৃথিবীতে স্থলভাগের তুলনায় সাগরের সীমানা যদি কম হত তাহলে স্থলভাগ মরুভূমিতে পরিণত হত এবং প্রাণী অস্তিত্ব হত অসম্ভব।

একজন বিজ্ঞবান লোক যিনি এই বিষয়ে চিন্তা করেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন যে পৃথিবীতে এরূপ পরিপূর্ণ ভারসাম্যের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই যুগপৎ ঘটনা নয়। এসব সম্বন্ধে দর্শনও ভাবনাসমূহ দেখায় যে একজন গৌরবান্বিত এবং চিরন্তন শক্তির মালিক একটি উদ্দেশ্যে এসব সৃষ্টি করেছেন।

সর্বোপরি, তিনি আরও স্মরণ করেন যে নজির এর উপর তিনি অনুধ্যান করছেন তা সংখ্যায় খুবই সীমাবদ্ধ। সত্যি বটে, পৃথিবীতে সূক্ষ্ম ভারসাম্য সম্পর্কিত নজিরসমূহ গণনা করা অসম্ভব। তথাপি একজন ব্যক্তি যে অনুধ্যান করে সহজেই শৃঙ্খলা, পূর্ণতা এবং ভারসাম্যতা যা বিশ্বের প্রতি কোণায় বিরাজ করে তা দেখেন এবং এরূপে উপসংহারে পৌছেন যে আল্লাহ মানুষের জন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ কোরআনে এটি এভাবে বর্ণনা করেন ঃ

> *আর তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমানে এবং যা কিছু আছে জমিনে সর্বত্রই। এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন করেছে ঐ সব লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে।*
>
> *(সূরা জাছিয়া ঃ ১৩)*

পারলৌকিক অবস্থা একজনকে কি ভাবায়?

প্রত্যেকেই পারলৌকিক অবস্থা ধারণা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল, তথাপি আপনি কি এ সম্বন্ধে ভেবেছেন? এটি বিষয়সমূহের একটি যার উপর আল্লাহ বিশ্বাসীরা অনুধ্যান করে।

আল্লাহ কর্তৃক বেহেশতে ও দোযখের অনন্ত জীবনের সৃষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যার উপর প্রত্যেকের চিন্তা করা প্রয়োজন। একজন যিনি এর উপর চিন্তা করে তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঃ বেহেশতের শাশ্বত প্রকৃতির সর্বোত্তম পুরষ্কারগুলোর মধ্যে একটি যা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে দান করা হয়। বেহেশতের মহিমাময় জীবনের কখনও শেষ নেই। মানুষ এই পৃথিবীতে বড় জোড় একশত বছর বাঁচতে পারে। বেহেশতের জীবন যাহোক অনন্তকালের, যেন এক কোয়াড্রিলিয়ন সময়ের তুলনায় এক কোয়াড্রিলিয়ন বছর স্বল্পকাল।

এক ব্যক্তি যিনি এগুলো স্মরণ করেন তিনি উপলব্ধি করেন একজন মানুষের পক্ষে শাশ্বতকাল হৃদয়ঙ্গম করা সম্পূর্ণ কঠিন। এরূপ একটি উদাহরণ বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দিতে পারে ঃ যদি এক কোয়াড্রিলিয়ন লোক যারা এক কোয়াড্রিলিয়ন সময়ে এক কোয়াড্রিলিয়ন রাত ও দিন অবস্থান করে এবং এদের প্রত্যেকে এক কোয়াড্রিলিয়ন বছরের জীবন থাকে যা শেষ পর্যন্ত কাটিয়ে শেষ করে সর্বমোট যে সংখ্যা দাঁড়াবে তা অনন্তকালের জীবনে ব্যয়িত বছরের সংখ্যার তুলনায় তা তখন "শূন্য" এর মত থাকবে।

যে ব্যক্তি এই বিষয়গুলোর উপর ভাবে নিম্নলিখিত উপসংহারে পৌছে থাকে ঃ আল্লাহর এরূপ বিরাট জ্ঞান আছে যে, যা মানুষের জন্য 'চিরস্থায়ী' তাঁর দৃষ্টিতে তা আগেই শেষ হয়ে গেছে। প্রত্যেক ঘটনা এবং প্রত্যেক তা চিন্তা যা সংঘটিত হয়েছে তার প্রথম মুহূর্ত সময় শুরু হয়ে ছিল শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের সময় ও আকার জানাশোনার মধ্যেই নির্ধারিত হয় ও সমাপ্তি ঘটে।

একইভাবে একজনের ভাবা উচিত যে দোযখ এমন একটি স্থান যেখানে অবিশ্বাসীরা অনন্তকাল বাস করবে। দোযখে বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্রণা, দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়ণ এবং দুঃখ-কষ্ট থাকে। অবিশ্বাসীরা দোযখে বিরামহীন শারীরিক ও আত্মিক যন্ত্রণার শিকার হয়, যা কখনও থামে না, ভোগকারীদের কখন ঘুম অথবা বিশ্রামের জন্যও কোন সময় ছেড়ে দেওয়া হয় না। দোযখের জীবনের যদি কোন শেষ থাকতো, দোযখের অধিবাসীদের আশা থাকতো এমনকি যদি সে বিশ্রাম হত কোয়াড্রিলিয় বছর পরের। তথাপি, যা তারা তাদের আল্লাহর সাথে অংশীদার এবং তাদের অবিশ্বাস এর প্রতিফল হিসাব পায় তা হল অনন্তকালের যন্ত্রণা।

> *"যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্বন্ধে অহংকার করেছে তারাই দোযখের অধিবাসী সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে।" (সূরা আ'রাফ ঃ ৩৬)*

পরকাল সম্বন্ধে অনুধ্যান করে একে উপলব্ধি করা একজনের জন্য চূড়ান্তভাবে জরুরি। এটা মানুষের পরকালের জন্য প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেয় এবং তার ভয় ও আশা পুনরায় বলশালী করে। যখন সে প্রবলভাবে অনন্তকালের যন্ত্রণাকে ভয় করবে চিরকালের পরমসুখ পাওয়ার জন্য আশা পোষণ করবে।

স্বপ্ন সম্বন্ধে একজন কি চিন্তা করে?

যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে তার জন্য স্বপ্নের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য থাকে। এরূপ ব্যক্তি চিন্তা করে, ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি যে স্বপ্ন দেখেন, তা কিরূপ 'বাস্তব', যা তার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার মুহূর্তে অবাস্তব থেকে আলাদা কিছু নয়। উদাহরণস্বরূপ একজনের দেহ বিছানায় শায়িত থাকা সত্ত্বেও, স্বপ্নে তিনি ব্যবসাজনিত ভ্রমণে গেলেন, নবাগত লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং গান শুনতে শুনতে দুপুরের ভোজন সারলেন। তিনি খাবারের স্বাদ উপভোগ করলেন, গানের সাথে নাচলেন, ঘটনাবলি ঘটার কারণে উত্তেজিত হলেন সুখী হলেন, অসুখী হলেন, ভয় পেলেন, ক্লান্তি অনুভব করলেন। এমনকি তিনি গাড়ি চালালেন যা পূর্বের সেদিন পর্যন্ত চালান নি, এমনকি গাড়ি চালাতে জানেন না।

যদিও তার দেহ বিছানায় নিথরভাবে পড়ে আছে, তার চোখ বন্ধ, তিনি যেখানে ছিলেন তার চেয়ে ভিন্ন ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখলেন। এর অর্থ হল যা তিনি দেখলেন এটা তার চোখ ছিল না। যে কক্ষে শুয়েছিলেন সেটা ছিল জনশূন্য, তিনি গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তাই যা ধারা শোনা হল এটা তার কান নয়। সব কিছু ঘটেছিল তার

মস্তিষ্কে। অথচ প্রত্যেক কিছু ছিল অতি বাস্তব যেন প্রতিটি ছবি ছিল আসল অবয়বে। যে যদিও কোনটিই বাহ্যিক জগতে আসল ছিল না, তা হলে এটা কি এমন বাস্তব ছবি মস্তিষ্কে তৈয়ার করে? মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন সচেতন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারে না। মস্তিষ্কও নিজে নিজে এরূপ প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে না। মস্তিষ্ক হল আমিষ অনুগঠিত এক পিণ্ড মাংস। এরূপ বস্তু নিজে নিজে প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে এরূপ দাবি করা অত্যন্ত অযৌক্তিক এবং এটা এমনকি মানুষের মুখমণ্ডল, স্থান এবং শব্দ যা কখনও সেদিনের আগে দেখা অথবা শোনা যায়নি তা তৈরি করে। তাহলে তিনি কে যিনি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে প্রতিচ্ছবিগুলো দেখান? যিনি এরূপ প্রশ্নের ব্যাপারে অনুধ্যান করেন তিনি আবার স্পষ্ট সত্য দেখতে পান ঃ তিনি হলেন আল্লাহ যিনি মানুষকে ঘুম পাড়ান, ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের আত্মা নিয়ে যান, জাগার সময়ে তা আবার ফিরিয়ে দেন এবং ঘুমের সময় স্বপ্ন দেখান।

যে ব্যক্তি জানেন যে আল্লাহই স্বপ্নগুলো দেখান তিনি স্বপ্নের ভেতর লুকানো উদ্দেশ্যের উপর এবং তাদের সৃষ্টির কারণ সম্পর্কে অনুধ্যান করেন। একজন স্বপ্ন দেখার পর জেগে ওঠে তিনি যে লোক ও ঘটনাসমূহ অবলোকন করেছেন তা নিশ্চিত বলে মনে করেন। আমরা মনে করি তাদের সবকিছুই বাস্তবে বিরাজমান, জীবন যা আমরা স্বপ্নে দেখি তা অব্যাহত এবং চলমান। যদি কেউ আমাদের কাছে এসে বলে "তোমরা এখন একটি স্বপ্ন দেখবে, জাগ্রত হও," আমরা তাকে বিশ্বাস করব না। অপরপক্ষে, যে কেউ এটা উপলব্ধি করে, সে যা চিন্তা করে তা নিম্নরূপ ঃ কে বলতে পারে যে এই পার্থিব জীবন অস্থায়ী নয় এবং জীবন স্বপ্নের মতন। ঠিক যখন আমি একটি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠি, তেমনি এই পার্থিব জীবন থেকেও একদিন জেগে উঠব এবং সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন ধরনের প্রতিচ্ছবি দেখব, উদাহরণস্বরূপ, পরকালের প্রতিচ্ছবি।

কোরআনের আয়াতসমূহ চিন্তা করা

সকল মানুষের প্রতি নাজিলকৃত আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব হল কোরআন। এই পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তির কোরআন শিক্ষা করা এবং এর ভেতরে যে আদেশসমূহ প্রদান করা হয়েছে তা পালন করা নীতিগতভাবে তার দায়িত্ব। অবশ্য অধিকাংশ লোক এটি শিক্ষা করে না এবং যদিও তারা জানে এটি একটি ঐশ্বরিক কিতাব, তবুও কোরআনে প্রদত্ত আদেশসমূহ পালন করে না। কোরআনকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা বরং এখান থেকে সেখান থেকে এর সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে একে জানার ফলশ্রুতি এটি। অপরপক্ষে, কোরআনের গুরুত্ব এবং মানব জীবনে এর অবস্থানের উপর যে ব্যক্তি চিন্তা-ভাবনা করে তার জন্য এটি বিরাট ব্যাপার।

সর্বাগ্রে যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে সে তার স্রষ্টাকে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং বিশ্ব যেখানে সে বসবাস করে, সে যখন কিছুই ছিলনা তখন যিনি তাকে জীবন দান করেছেন, এবং অসংখ্য নিয়ামত, সুন্দর জিনিস যিনি তাকে প্রদান করেছেন সেই স্রষ্টাকে জানতে চায়। কেউ কেউ তিনি (আল্লাহ) কি প্রকার আচরণে খুশি হন তা জানতে পছন্দ করে। উপরোল্লিখিত এই প্রশ্নের জবাব দেবার গাইড হল কোরআন যা আল্লাহ তার রাসূলের মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন। এই কারণে আল্লাহ মানুষের নিকট গাইড হিসেবে যে কিতাব নাজিল করেছেন তা তার জানার দরকার এবং যাতে মন্দ থেকে ভাল এর পার্থক্য করে দিয়েছেন। আয়াত সম্বন্ধে তার গভীর চিন্তা করার এবং সর্বোত্তমভাবে ও খুশির সাথে তা পালন করা দরকার।

মানুষের নিকট যে উদ্দেশ্য কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহ তা বর্ণনা করেছেন ঃ

এ কোরআন একটি বরকতময় কিতাব আমি তা আপনার উপর নাজিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধ্যান করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা এর উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা সাদ ঃ ২৯)

না তা কখনই হবে না, বরং এ কোরআনই উপদেশ বাণী। অতএব যার ইচ্ছা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক। আর যারা উপদেশ গ্রহণ করবে না যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তিনিই সেই সত্ত্বা যাকে ভয় করা উচিত। আর তিনিই বান্দার পাপ মার্জনা করার অধিকারী। (সূরা মুদাচ্ছির ঃ ৫৪-৫৬)

বহু লোক কোরআন পাঠ করে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে ঠিক যেমন আল্লাহ তার আয়াত বর্ণনা করেছেন, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের উপর চিন্তা করতে, আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যে এবং এই শিক্ষা অনুসারে আচরণের উন্নতি সাধন করা। উদাহরণস্বরূপ কেই এই আয়াত পাঠ করে, নিশ্চয়ই বিপদ-আপদের সাথে সুখশান্তি সাথে রয়েছে, অবশ্যই দুঃখ-কষ্টের সাথেই সুখ-শান্তি রয়েছে। (সূরা ইনশিরাহ ঃ ৫-৬)

এর উপর অনুধ্যান করেন। তিনি বুঝতে পারে আল্লাহ প্রতিটি কষ্টের সাথে আরাম সৃষ্টি করেছেন এবং অতএব যখন তিনি কোন কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন কেবল একটি বিষয় তার করতে হবে তা হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখা এবং এর সাথে যে আরাম আছে তা খুঁজে নেয়া। আল্লাহর এরূপ শপথ হওয়ায়, আমরা দেখতে পাই আশা ছেড়ে দেয়া অথবা কষ্টের মুহূর্তে আতঙ্কিত হওয়া হল আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাসের দুর্বলতার নিদর্শন। আয়াত পাঠ করে এবং এর উপর অনুধ্যান করে আমাদের আচরণ সারা জীবন আয়াতের সাথে খাপ খেয়ে চলে।

আল্লাহ অতীতে যে রসূল ও নবীগণ জীবনযাপন করে গেছেন, কোরআনে আল্লাহ তাদের জীবন বর্ণনা করেছেন, যাতে মানুষ দেখতে পায় আল্লাহ যাদের প্রতি খুশী ছিলেন তাদের আচরণ, কথাবার্তা এবং জীবন কেমন ছিল এবং তাদেরকে উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা। আল্লাহ তাঁর কতিপয় আয়াতে বর্ণনা করেন যে মানুষ অবশ্যই নবীদের কাহিনী চিন্তাভাবনা করবে এবং এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে ঃ

"তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়।"

(সূরা ইউসুফ ঃ ১১১)

আর মূসার বৃত্তান্তের মধ্যে নিদর্শন রয়েছে, যখন আমি ফেরআউনের কাছে প্রকাশ্যে প্রমাণ দিয়ে পাঠালাম। (সূরা যারিয়াত ঃ ৩৮)

অবশেষে আমি রক্ষা করলাম তাকে ও তার সঙ্গী নৌকারোহীদেরকে এবং এ ঘটনাকে করলাম একটি নিদর্শন বিশ্ববাসীর জন্য। (সূরা ঃ আনকাবুত ঃ ১৫)

কোরআনে অতীত জাতিসমূহের কিছু কিছু তাদের আচার-আচরণ এবং তাদের উপর নিপতিত বিপর্যয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো কেবলমাত্র ঐতিহাসিক ঘটনাবলির বর্ণনা যা অতীত জাতিসমূহে সংঘটিত হয়েছে সেই হিসেবে পাঠ করলে তা হবে নিদারুন ভ্রান্ত ধারণা। এটার কারণ, ঠিক যেমন অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করার জন্য এবং যে সকল ঘটনা যা জাতিসমূহে ঘটেছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের আচরণ সংশোধনের জন্য আয়াতসমূহ নাজিল করেছেন। (সূরা কামার ঃ ৫১, সূরা কামার ঃ ১৩-১৭)

আল্লাহ গাইড হিসেবে কোরআনকে মানুষের প্রতি নাজিল করেছেন। সুতরাং কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত এর উপর অনুধ্যান করতঃ এর থেকে শিক্ষা ও সতর্কতা গ্রহণ করে তা অনুসরণ করে জীবন যাপন করাই হল আল্লাহর সমর্থন ক্ষমা এবং বেহেশত লাভের একমাত্র পথ।

আল্লাহ কোরআন সম্বন্ধে কি ভাবতে মানুষকে আহ্বান করেন

তাদেরকে আমি প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসমূহ আর আপনার প্রতি নাজিল করেছি কোরআন যাতে আপনি মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তারা যেন ভেবে দেখে। (সূরা নাহল ঃ ৪৪)

ঠিক যেমন সূরা নাহল-এর আয়াতে তেমনি তাঁর (আল্লাহ) অন্যান্য বহু আয়াতে আল্লাহ মানুষকে অনুধ্যান করার জন্য আহ্বান করেছেন। আল্লাহ চিন্তা-ভাবনা করার জন্য যে সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন তার উপর চিন্তা করা এবং গুপ্ত উদ্দেশ্য ও সৃষ্টিগত অলৌকিত্ব প্রত্যক্ষ করা হল উপাসনার কাজ। প্রতিটি বিষয় যার উপর আমরা চিন্তা করি তা আল্লাহর অসীম শক্তি প্রজ্ঞা, জ্ঞান, আর্ট এবং আল্লাহর অন্যান্য গুণাগুণ আরও বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে।

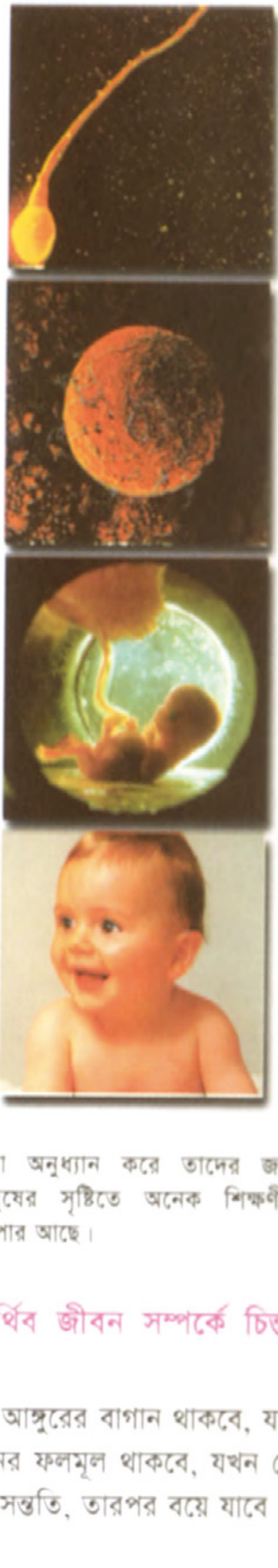

আল্লাহ মানুষকে তার নিজ সৃষ্টি সম্পর্কে ভাবতে আহ্বান করেন

আর মানুষ বলে ঃ *যখন আমি মরে যাব, তখন কি পুনরায় আমাকে জীবিত করা হবে? মানুষ এ কথা স্মরণ করে না যে ইতিপূর্বে আমিই তাকে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না।* (*সূরা মরিয়ম ঃ ৬৬-৬৭*)

আল্লাহ মানুষকে বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে ভাবতে আহ্বান করেন

নিশ্চয়ই আসমান ও জমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের জন্য কল্যাণ সাধনকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে জমিনকে তার মৃত্যুর পর যে পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে, সব ধরনের জীবজন্তু সেথায় বিস্তার করেন, বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আসমান ও জমিনের মধ্যে মিশ্রিত মেঘমালাতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের জন্য নিদর্শন। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৪)

যারা অনুধ্যান করে তাদের জন্য মানুষের সৃষ্টিতে অনেক শিক্ষণীয় ব্যাপার আছে।

আল্লাহ মানুষকে এই ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির পার্থিব জীবন সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান করেন

তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার একটি খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান থাকবে, যার পাদদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে এবং যাতে সব ধরনের ফলমূল থাকবে, যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হবে আর তার থাকবে দুর্বল সন্তান-সন্ততি, তারপর বয়ে যাবে ঐ

বাগানের উপর দিয়ে এক অগ্নিগর্ভ প্রবল ঘূর্ণিঝড়, ফলে বাগানটি ভস্মীভূত হয়ে যাবে? এভাবে আল্লাহই তোমাদের জন্য তার নির্দেশনাবলি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করতে পার। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৬)

পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরূপ যেমন আসমান থেকে আমি পানি বর্ষণ করি। পরে তা সংমিশ্রিত হয়ে তা থেকে জমিনের ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু খেয়ে থাকে। তারপর জমিন যখন মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ধারণ করে এবং সুশোভিত হয়ে ওঠে আর জমিনের মালিকেরা ধারণা করে যে, তারা এখন এগুলো পূর্ণ অধিকারী তখন এসে পড়লে তাঁর উপর আমার নির্দেশ রাতে কিংবা দিনে ফলে আমি তার এমন নিশ্চিহ্ন করে দিলাম যেন গতকালও এর অস্তিত্ব ছিল না। এরূপেই আমি বিশদভাবে আয়াতসমূহ বর্ণনা করি। চিন্তাশীল লোকদের জন্য। (সূরা জোনাহ/ইউনুস ঃ ২৪)

আল্লাহ মানুষকে যে নিয়ামত দান করেছেন তার উপর ভাবতে আহ্বান করেন

তিনিই বিস্তৃত করেছেন ভূ-মণ্ডলকে এবং সেখানে সৃষ্টি করেছেন পর্বতমালা ও নদ-নদী এবং সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনিই দিনকে রাত্রি দিয়ে আবৃত করেন। এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য। আর পৃথিবীতে রয়েছে বিভিন্ন ভূ-খণ্ড একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র, খেজুরের গাছ যার কতক একাধিক শিরা বিশিষ্ট এবং কতক এক শিরা বিশিষ্ট যা একই পানি দিয়ে সেচ করা হয়। আর ফলের স্বাদ একটিকে অপরটির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

(সূরা রাদ ঃ ৩-৪)

আল্লাহ মানুষকে এই সত্য ভাবতে আহ্বান করে যে সমগ্র বিশ্ব মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে

আর তিনি নিজের অনুগ্রহে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন যা কিছু আছে আসমানে যা কিছু আছে জমিনে সবই। এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শন ঐ সব লোকদের জন্য যারা চিন্তা করে। (সূরা জাসিয়া ঃ ১৩)

তিনি তোমাদের জন্য এ পানি দিয়ে উৎপাদন করেন শস্য, যায়তুন, খেজুর, আঙ্গুর এবং সব রকমের ফল। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন। তিনিই তোমাদের উপকারে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিনকে, সূর্য ও চন্দ্রকে; আর নক্ষত্র রাজিও তাঁর নির্দেশে বশীভূত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে জ্ঞানবান লোকদের নিদর্শন। আর বিভিন্ন বর্ণের বিভিন্ন ধরনের বস্তু যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন সে সব লোকের জন্য যারা উপদেশ প্রদান করে। তিনিই সমুদ্রকে বশীভূত করেছেন যেন তোমরা তা থেকে টাটকা গোশত (মাছ) খেতে

পার এবং যেন তা থেকে বের করতে পার মনিমুক্তা যা তোমরা পরিধান কর; তুমি তা তাতে জলযানসমূহ যা পানির চিড়ে চলতে দেখবে, এজন্য তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আর তিনি পৃথিবীতে গুরুভার পর্বতমালা স্থাপন করেছেন যাতে তোমাদের নিয়ে দুলতে আরম্ভ না করে, এবং নদ-নদীও নানা ধরনের পথ সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা নিজ গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার। এবং তিনি সৃষ্টি করেছেন পথ নির্ণায়ক বহু চিহ্ন। আর নক্ষত্রের সাহায্যেও তারা পথের সন্ধান পায়।

তবে কি তিনি সৃষ্টি করেন তিনি তার মত, যে সৃষ্টি করতে পারে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? (সূরা নাহল ঃ ১১-১৭)

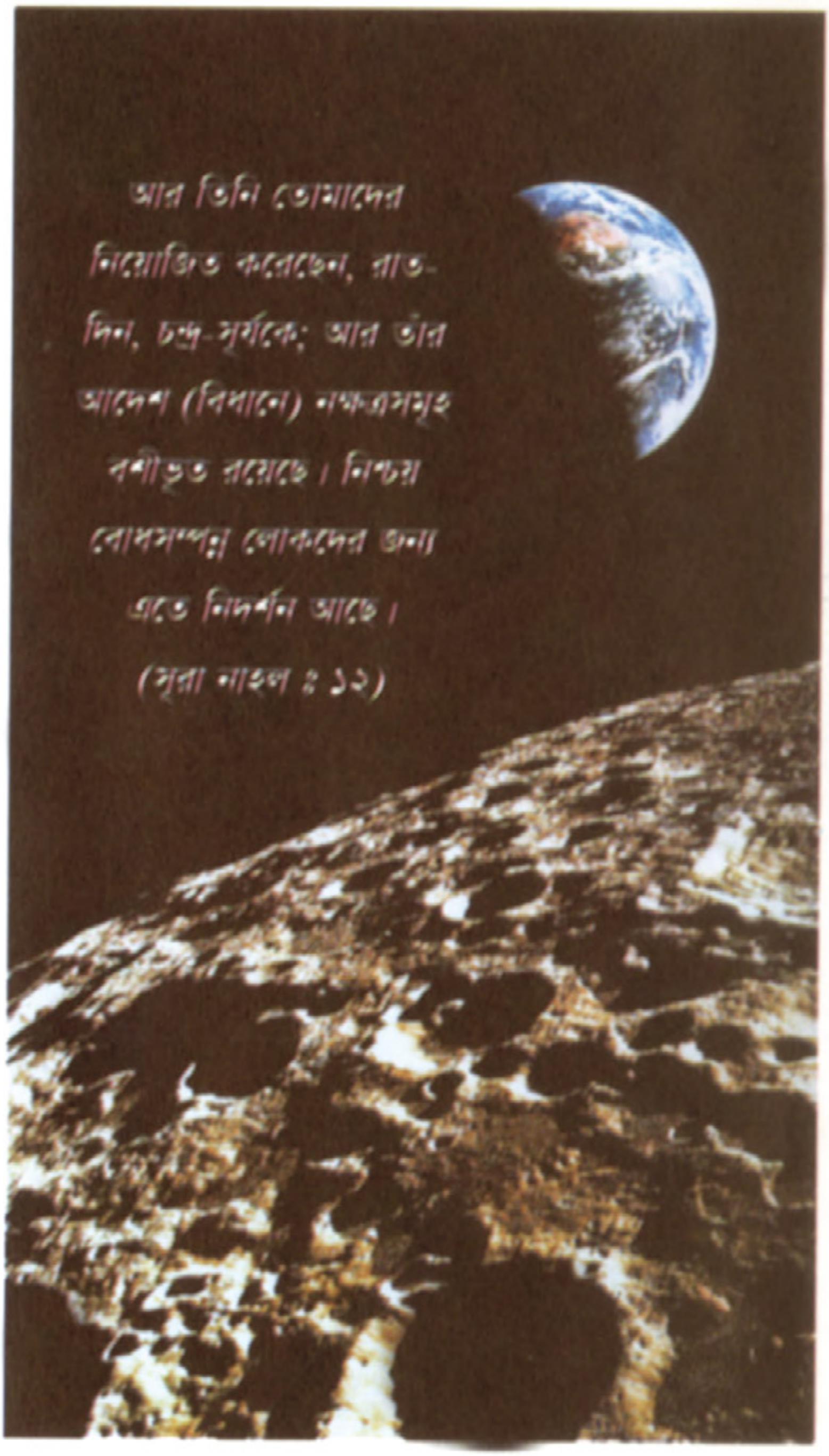

আল্লাহ মানুষকে নিজ সম্বন্ধে ভাবতে আহ্বান করেন

তারা কি তাদের নিজদের মনে ভেবে দেখে না। (সূরা রূম ঃ ৮)

তারা কি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেনা, কিভাবে তা সৃষ্টি করলাম,
কিভাবে সুশোভন করলাম, আর তাতে কোনো ছিদ্র নেই? আর আমি
পৃথিবীকে বিস্তৃত করলাম এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করলাম, চোখ
জোড়ানো প্রত্যেকটি উদ্ভিদ উঠালাম। আল্লাহর অনুরাগী সকল বান্দার
জন্য জ্ঞান ও উপদেশরূপে। (সূরা ক্বাফ ঃ ৬-৮)

আল্লাহ মানুষকে সৎ মূল্যবোধ ও কর্ম সম্বন্ধে ভাবতে আহ্বান করেন

এতিম সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তোমরা সদুদ্দেশ্য ছাড়া তার সম্পদের কাছেও যাবে না এবং পরিমাণ ও ওজন ঠিকভাবে পুরোপুরি দিবে। আমি কাউকে তার সাধ্যতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়পরায়ণতা বহাল রাখবে, যদিও সে আত্মীয় হয়। আর আল্লাহকে দেয়া ওয়াদা পূর্ণ করবে। এসব নির্দেশ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা আনাম ঃ ১৫২)

নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার করার ও সদাচরণের এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ ও অবাধ্যতা করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেয় যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

(সূরা নাহল ঃ ৯০)

হে, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা প্রবেশ করনা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে যে পর্যন্ত না সে সব গৃহবাসীদের অনুমতি গ্রহণ কর এবং তাদেরকে সালাম কর এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (সূরা নুর ঃ ২৭)

আল্লাহ মানুষকে পরকাল, কিয়ামত, বিচার দিনের কথা ভাবতে আহ্বান করেছেন

যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের কৃত ভাল কাজসমূহ সামনে উপস্থিত পাবে এবং সে যে মন্দ কাজ করেছে তাও পাবে, সেদিন সে ব্যক্তি তারও সে সব মন্দ কাজের জন্য দূর ব্যবধান কামনা করবে। আল্লাহ নিজের সত্তা সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মমতাময়। (সূরা ইমরান ঃ ৩০)

স্মরণ কর আমার বান্দা ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের কথা তারা ছিলেন কর্মশক্তি ও জ্ঞান শক্তি সম্পন্ন।

আমি তো তোদেরকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলাম এক বিশেষ গুণে তা হল আখেরাতের স্মরণ। (সূরা সাদ ঃ ৪৫-৪৬)

তারা তো কেবল এই অপেক্ষা করছে যে, অকস্মাৎ তাদের কাছে কেয়ামত এসে পড় ক। কেয়ামতের লক্ষণগুলো তো এসেই পড়ছে। অতএব কেয়ামত যখন তাদের সামনে এসে পড়বে, তখন তাদের উপদেশ গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে কোথায়?

(সূরা মোহাম্মদ ঃ ১৮)

আল্লাহ যে প্রাণী সৃষ্টি করেছেন তা সম্বন্ধে ভাবতে আহ্বান করেন

আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে; তারপর চোষন করে নাও প্রত্যেক ফল থেকে এবং চলস্বীয় রবের সহজ সরল পথে। তার পেট থেকে বের করে আনা হয় রঙের

আর তিনি আল্লাহ,
তিনি ছাড়া আর
কোনো ইলাহ নেই।
ইহ-পরকালে সকল
প্রশংসা তাঁরই, তাঁরই
বিধান তোমরা তাঁরই
কাছে যাবে।
(সূরা কৃসাসা ঃ ৭০)

পানীয় যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন। (সূরা নাহল ঃ ৬৮-৬৯)

আল্লাহ মানুষকে আহ্বান করেন ঐ শাস্তি সম্বন্ধে যা অকস্মাৎ তাদের উপর পতিত হতে পারে

বলুন ঃ আচ্ছা বলতো, যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর কোন আযাব এসে পৌছে অথবা তোমাদের কাছে কেয়ামত এসে যায়, তবে তোমরা কি আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে ডাকবে, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (সূরা আনআম ঃ ৪০)

বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন এবং তোমাদের স্তরসমূহের উপর মোহর মেরে দেন, তবে আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ আছে যে, এগুলো তোমাদের ফিরিয়ে

দেবে? দেখ আমি কিরূপে বিশদভাবে নিদর্শনাবলি বর্ণনা করি, তথাপি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা আনআম ঃ ৪৬)

বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর অকস্মাৎ কিংবা প্রকাশ্যে আপতিত হয়, তবে জালিম কওম ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি?

(সূরা আনআম ঃ ৪৭)

বলুন ঃ তোমরা কি ভেবে দেখেছ, যদি এসে পড়ে তার আযাব তোমাদের উপর রাতে বা দিনে, তবে এর মধ্যে কী আছে যা, অপরাধীরা ত্বরান্বিত করতে চায়?

(সূরা ইউনুস ঃ ৫০)

তারা কি দেখে না যে, তারা প্রতি বছর একবার কি দুবার বিপর্যস্ত হয়? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। (সূরা তওবা ঃ ১২৬)

পূর্ববর্তী অনেক মানবগোষ্ঠিকে ধ্বংস করার পর আমি তো মূসাকে দিয়েছিলাম কিতাব, যা ছিল লোকদের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা কাসাস ঃ ৪৩)

আমি তো ধ্বংস করেছি তোমাদের সমপন্থী দলগুলোকে অতএব এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কামার ঃ ৫১)

আমি তো পাকড়াও করেছিলাম ফেরাউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষ ও ফল ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। (সূরা ঃ আ'রাফ-১৩০)

আল্লাহ মানুষকে কোরআন সম্বন্ধে ভাবতে আহ্বান করেন

তবে কি তারা কোরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও তরফ থেকে এ কোরআন হত তবে তারা এতে অনেক বৈপরীত্য পেত।

(সূরা নিসা ঃ ৮২)

তবে কি তারা এ কালাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না? না তাদের কাছে এমন কিছু এসেছে যা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে আসেনি। (সূরা মোমিনুন ঃ ৬৮)

এ কোরআন একটি বরকতময় কিতাব, আমি তা আপনার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানবান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

(সূরা সাদ ঃ ২৯)

আমি তো আপনার ভাষায় কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরা দুখান ঃ ৫৮)

না তা কখনই হবে না। বরং এ কোরআনই উপদেশ বাণী অতএব যার ইচ্ছা সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা মুদ্দাছির ঃ ৫৪-৫৬)

এভাবেই আমি এ কিতাবকে আরবি ভাষায় কোরআনরূপে নাজিল করেছি এবং এতে বিভিন্নরূপে সতর্কবাণী বিবৃত করেছি, যাতে তারা ভয় করে। কিংবা এ কোরআন তাদের জন্য উপদেশ হয়। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১১৩)

আল্লাহর রাসূলগণ যে সকল লোকের বোধশক্তি কম তাদের ভাবতে আহ্বান করেন

আপনি বলুন ঃ আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্য বিষয় সম্বন্ধেও অবগত নই এবং আমি তোমাদের একথাও বলিনি যে আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ওহীর অনুসরণ করি যা আমার প্রতি নাযিল হয়। আপনি বলে দিন ঃ অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি কি সমান হতে পারে? অতএব তোমরা কি ভেবে দেখ না? (সূরা আন'আম ঃ ৬০)

তাঁর কওম তাঁর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি আমার সাথে আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করছ? অথচ তিনি তো আমাকে পথ দেখিয়েছেন। আমার রব অন্য কিছু ইচ্ছা না করলে আমি ভয় করি না তাকে যাকে তোমরা তার শরীক কর। সব কিছুই আমার রবের জ্ঞানায়ত্ত। তোমরা কি তবুও ভেবে দেখ না?

(সূরা আন'আম ঃ ৮০)

আল্লাহ মানুষকে শয়তানের প্রভাব প্রতিরোধ করার আহ্বান জানান

যদি প্ররোচিত করে তোমাকে শয়তানের প্ররোচনায়, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। নিশ্চয়ই তারা তাকওয়া অবলম্বন করে শয়তান যখন তাদের কুমন্ত্রণা দেয়। তখন তারা আল্লাহর স্মরণে মশগুল হয়। ফলে তখনই তাদের অন্তর চক্ষু খুলে যায়। আর শয়তানের ভাইয়েরা তাদেরকে ক্রমাগত গোমরাহীর দিকে আকর্ষণ করতে থাকে এবং তাতে তারা কোন ত্রুটি করে না।

(সূরা আ'রাম ২০০-২০২)

আল্লাহ উৎসাহিত করেন ঐ ব্যক্তিকে যার নিকট গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য অবহিত করা হয়

তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহ নিয়া যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়েই ফেরআউনের কাছে যাও, সে খুব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তোমরা তার সাথে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

(সূরা ত্ব-হা ঃ ৪২)

আল্লাহ মানুষকে মৃত্যু এবং স্বপ্ন সম্পর্কে ভাবতে আহ্বান করেন

আল্লাহই মানুষের জান কবজ করেন তার মৃত্যুর সময় এবং যার মৃত্যু আসেনি তাঁর ও নিদ্রাকালে। অতঃপর যার জন্য তিনি মৃত্যু ফয়সালা করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অন্যান্যগুলো এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছেড়ে দেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য। (সূরা যুমার ঃ ৪২)

উপসংহার

এই পুস্তকের লক্ষ্য হল, "চিন্তা করতে আহ্বান" জানানো। সত্য জিনিসটা বিভিন্নভাবে একজনকে বলা যায়, এটার খুঁটিনাটি ব্যবহার দ্বারা, সাক্ষ্য প্রমাণের দ্বারা এবং প্রত্যেক উপায়ে দেখানো যেতে পারে। তথাপি যদি এই ব্যক্তি নিজে নিজে এই সত্যকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে আন্তরিক ও সততার সাথে চিন্তা না করেন, তার সকল প্রচেষ্টা বিফলে যায়। এ কারণে যখন আল্লাহর দূত মানুষের নিকট তাঁর (আল্লাহ) বার্তা বিনিময় করে ছিলেন, তারা তাদের (হক) সত্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন এবং তার পর তাদেরকে চিন্তা করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যে ব্যক্তি অনুধ্যান করে আল্লাহর সৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন, এই পার্থিব জীবনের, জাহান্নাম ও জান্নাতের সত্যতা এবং বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্যতাকে তিনি উপলব্ধি করে থাকেন। তিনি, যে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, তার গুরুত্ব সম্পর্কে গভীরতরভাবে প্রণিধান করতে পারেন এবং তিনি ধর্মকে যেমন যথোচিত মর্যাদা থাকা দরকার তা অক্ষুন্ন রাখেন, তিনি প্রত্যেক বস্তু যা দেখেন তাতে আল্লাহর গুণ সনাক্ত করতে পারেন এবং বেশির ভাগ লোক যেমন দাবি করেন তেমন চিন্তা করতে শুরু করেন। ফলে অন্যজন যে সৌন্দর্য থেকে আনন্দ লাভ করেন, তার চেয়ে তিনি বেশি আনন্দ পান এবং ভিত্তিহীন ভুল বুঝাবুঝি প্রসূত নিদারুণ বেদনা দুর্ভোগ পোহান না ও পার্থিব লোভ-লালসা প্রসূত বেদনা ভোগ করেন না।

সুন্দর জিনিষগুলির মধ্যে এগুলি কয়েকটি যা একজন ব্যক্তি যিনি চিন্তা করেন, তিনি পৃথিবীতে পাবেন। যে ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে সত্যকে বুঝেন তার পরকালের অর্জন হল, আমাদের প্রভুর বেহেশতের ভালবাসা, অনুমোদন এবং ক্ষমা।

অপরপক্ষে, এমন দিন হাতেই আছে যখন আজ যারা সত্যকে দর্শন করে এড়িয়ে যায় তারা চিন্তা করতে পারবেন এবং তার উপর "গভীরভাবে চিন্তা কর ও ধ্যান কর" এবং সত্যকে দেখতে পাশে পরিষ্কার উজ্জল তথাপি তাদের চিন্তা সেই দিন কোন কাজে আসবে না কিন্তু তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করাবে। আল্লাহ কোরআনের বলেন যখন এই লোকজন অনুধ্যান করবে ঃ

> *অতঃপর যখন মহা সংকট উপস্থিত হবে সেদিন মানুষ কৃতকর্ম স্মরণ করবে এবং দর্শকদের জন্য দাও দাও করা অগ্নি (জাহান্নাম) প্রদর্শিত হবে। (সূরা আন-নাজিরাত ঃ ৩৪-৩৬)*

মানুষকে আহ্বান করে যিনি মনে করেন যে তারা চিন্তাহীনতা দ্বারা দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন, ভাবেন যেন তারা শেষ পরিণতির উপর অনুধ্যান করতে পারে যা তাদের উপর পতিত হয় এবং আল্লাহর ধর্মের প্রতি প্রত্যাবর্তন হল মোমেনদের জন্য উপাসনার কাজ। তথাপি, যেমন আমাদের প্রভু কোরআনে বলেন ঃ

> *"অতএব যার ইচ্ছা সে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করুক।" (সূরা মুদ্দাচ্ছির ঃ ৫৫)*

বিবর্তন প্রবঞ্চনা

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয়ই কিছু এক উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্মের ইঙ্গিত প্রদান করে। অন্যদিকে বস্তুবাদ যা এই মহাবিশ্বে সৃষ্টিকর্মের প্রকৃত সত্যকে অস্বীকার করার প্রয়াস চালায়। তা অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত বিশ্বাস বৈ আর কিছুই নয়।

জড়বাদ অসিদ্ধ, এই দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অপরাপর সমস্ত মতবাদও হয়ে পড়েছে ভিত্তিহীন। এদেরই সর্বাগ্রে হল ডারউইনিজম অর্থাৎ বিবর্তন মতবাদ। এই মতবাদ যা যুক্তি প্রদান করে যে, প্রাণ অজৈব ব্যবস্থা থেকে যুগপৎ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্মোষিত হয়েছে, তা আল্লাহতায়ালার দ্বারা বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হয়েছে, এই স্বীকৃতির মাধ্যমে নস্যাত হয়ে গেছে। আমেরিকার জ্যোতি পদার্থবিদ হিউগ রস (Hugh Ross)-এর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

নাস্তিকতাবাদ, ডারউইনবাদ এবং কার্যত সকল 'বাদ' যা অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দর্শন থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তা ভুল অনুমান, বিশ্ব অসীম এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই অদ্ভুত তথ্য আমাদেরকে কারণ অথবা কারণের ঘটক পূর্বে/পশ্চাত/ সম্মুখে এর সাথে আমাদের বিশ্ব চরাচর প্রাণসহ যা ধারণ করে, এর সাথে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে।

তিনি আল্লাহ যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন এবং এর যাবতীয় খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু তিনি পরিকল্পনা করেছেন। অতএব প্রাণসমূহ আল্লাহতালার সৃষ্টি নয় বরং এক আকস্মিক যোগাযোগের ঘটনায় উৎপত্তি লাভ করেছে, বিবর্তনবাদের এই ধারণা অসম্ভব।

আশ্চর্য নয় যে, যখন আমরা বিবর্তন মতবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করি তখন দেখতে পাই যে, এটা বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো দ্বারাই নিন্দিত হয়েছে। প্রতিটি জীবের ডিজাইন, অত্যন্ত জটিল আর দৃষ্টি আকর্ষণকারী। উদাহরণস্বরূপ জড় জগতে অনুসন্ধান করে দেখতে পাই কেমনে সংবেদনশীল এক ভারসাম্যের উপর এই পরমাণুগুলো নির্ভরশীল এবং আরও জীবজগতে আমরা লক্ষ্য করি কি এক জটিল ডিজাইনে এই পরমাণুগুলো একত্রিত হয় আর কেমনে অসাধারণ পদ্ধতির বিভিন্ন গঠনসমূহ যেমন ঃ আমিষ, উৎসেচক এবং কোষ যা তার সাথে গঠিত হয়।

জীবের এই অসাধারণ ডিজাইন বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ডারউইনবাদকে অকার্যকর বলে প্রতিপন্ন করেছে।

এই বিষয়ের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অন্যান্য জায়গায় আমরা করেছি এবং এখনও করব। যা হোক আমরা মনে করি বিষয়টির গুরুত্বের কারণে এখানেও ছোট একটি সারাংশ তৈরি করা কাজে লাগবে।

বৈজ্ঞানিকভাবে ডারউইনবাদের পতন

যদিও অতীতে প্রাচীন গ্রীস থেকেই একটি মতবাদ চালু হয়ে আসছিল তবে বিবর্তন তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ১৮৫৯ সালে 'প্রজাতির উৎপত্তি' নামে প্রকাশিত বই খানা এই মতবাদকে বিজ্ঞানের জগতে শীর্ষ টপিকে উন্নীত করে। ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় জীবসমূহ মহান আল্লাহ তায়ালা পৃথক পৃথকভাবে সৃষ্টি করেছেন, এই সত্যকে ডারউইন তার বইখানায় মেনে নেন নি। ডারউইনের মতে, সব জীবেরই কোন এক সাধারণ পূর্বপুরুষ ছিল যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কালের যাত্রায় বিভিন্ন বিচিত্র জীবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ডারউইনের মতবাদ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাপ্ত কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন ঃ তিনি নিজেও এটাকে নিছক এক অনুমান বলে গ্রহণ করেছেন। অধিকন্তু ডারউইন তার "থিওরীর প্রতিকূলতা" নামক বইটিতে দীর্ঘ অধ্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, থিওরীটি সমালোচনামূলক অনেক প্রশ্নের জবাব প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছিল।

ডারউইন নতুন কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পানে আশা করে রইলেন যা তার থিওরির প্রতিবন্ধকতা দূর করবে বলে তার প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু উল্টো দেখা গেল যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলো তার প্রত্যাশার বিপরীতে বরং তার মতবাদের সমস্যাবলির মাত্রাই বৃদ্ধি করল। বিজ্ঞানের মোকাবেলায় ডারউইনের এই মতবাদকে তিনটি মূল আলোচ্য বিষয়ে পুনঃনিরীক্ষা করা যায়।

১। ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের উন্মেষ হল কিভাবে এর ব্যাখ্যা এই মতবাদ কোনভাবে প্রদান করে না।

২। এমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রাপ্ত তথ্য নেই যে এই মতবাদ প্রস্তাবিত বিবর্তন পদ্ধতি মোটেই বিকশিত হবার ক্ষমতা রাখে।

৩। জীবাশ্ম রেকর্ডসমূহ বিবর্তন মতবাদ কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবনার সম্পূর্ণরূপেই প্রতিকূলেই প্রমাণ প্রদান করে।

এই পরিচ্ছেদে এই তিনটি মূল পয়েন্ট সাধারণ পরিধিতে আমরা ব্যাখ্যা করি।

জীব দেহের জটিল গঠন

প্রাণের উৎপত্তির প্রসঙ্গে বিবর্তন মতবাদের বড় একটা বাধার সম্মুখীন হওয়ার প্রাথমিক কারণ হল, যে সমস্ত জীব অত্যন্ত সরলতম গঠনের মনে করা হয়, তাদের অবিশ্বাস্য ধরনের এক জটিল গঠন থাকে। সব ধরনের মানব প্রযুক্তির দ্বারা তৈরি সমস্ত পণ্যের চেয়ে একটা জীবকোষ অনেক অনেক জটিল। আজ এই সময়ে এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত ল্যাবরেটরীগুলোতেও অজৈব বস্তুগুলোকে একত্রিক করে একখানি জীব কোষ তৈরি করা যায় না।

একখানি কোষ তৈরিতে প্রয়োজনীয় শর্তাদির সংখ্যা এত বিপুল যে এটাকে যুগপৎ ঘটনায় সংঘটিত হওয়ার ব্যাখ্যা দেওয়াই ভার। যে প্রোটিনগুলো কোষের কাঠামোতে ব্লক হিসেবে ব্যবহৃত হয় তার প্রতিটি গড়ে ৫০০ এমাইনো এসিড নিয়ে গঠিত। যুগপৎ সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় এই প্রতিটি প্রোটিন তৈরির সম্ভাবনা 10^{50} ভাগের এক ভাগ। গাণিতিকভাবে ১০^{৫০} ভাগের ১ ভাগের কম যে কোন সম্ভাবনা বাস্তবে অসম্ভব।

কোষের কেন্দ্রে অবস্থিত ডিএনএ (DNA) এক অকল্পনীয় ডাটা ব্যাংক যা বংশগতির (Genetic) সমস্ত তথ্য বহন করে থাকে। গণনা করে দেখা গেছে যে DNA তে যে তথ্যাদি সংকলিত আছে তা যদি লিপিবদ্ধ করা যায় তা হলে তা ৯০০ ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ার এক বিশালাকায় লাইব্রেরি তৈরি করবে। সেখানে প্রতি ভলিউম এনসাইক্লোপেডিয়ায় ৫০০ পৃষ্ঠা থাকবে।

এই পয়েন্টটিতে এক উভয় সংকট তৈরি হয়; যা হল ডিএনএ কিছু বিশেষ ধরনের প্রোটিন বা এনজাইমের সহায়তায় বিভাজিত হয়। আবার এই এনজাইমগুলো সংশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হওয়ার যাবতীয় তথ্যাবলি ডিএনএ-এর গায়ে সংকলিত থাকে। আর এই তথ্যগুলো থেকেই সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াগুলো বুঝে নেয়া যায়। দেখা যাচ্ছে যে, উভয়েই পরস্পর পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। আর তাই কোষ বিভাজনের সময় তাদের উভয়কে একই সাথে বিদ্যমান থাকতে হবে। এই রূপরেখা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণ নিজে নিজেই উৎপত্তি লাভ করবে—এ সম্ভাবনা একেবারেই অচল।

সান্ডিয়াগো ক্যালিকোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির সুনামধন্য বিবর্তনবাদবিজ্ঞানী প্রফেসর লেসলি অরগেল সাইন্টিফিক আমেরিকায়, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ম্যাগাজিনে এসবকে স্বীকার করে নিয়ে বলেছেন ঃ

"এটা একবারেই অসম্ভব যে গঠনগতভাবে জটিল প্রোটিন এবং নিউক্লিয়ক এসিড একই সময়ে একই জায়গা হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপন্ন হবে। তথাপি এদের একটি ছাড়া অন্যটির অস্তিত্ব অসম্ভব। আর তাই একজন প্রথম দৃষ্টিতেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন যে প্রাণ কখনও রাসায়নিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়নি।"

বলতে দ্বিধা নেই, যদি প্রাকৃতিকভাবে প্রাণের উৎপত্তির সম্ভাবনা না থাকে তখন এটাই মেনে নিতে হবে যে এক অতি প্রাকৃতিক উপায়েই প্রাণের সঞ্চার ঘটে। এই

সত্যটুকু সুস্পষ্টভাবেই সেই বিবর্তন মতবাদকে বাতিল ঘোষণা করে যার মুখ্য উদ্দেশ্য "সৃষ্টিকর্ম"কে অস্বীকার করা।

কাল্পনিক বিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহ

দ্বিতীয় যে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি ডারউইনের মতবাদকে বাতিল করে দেয় তা হল বিবর্তনের প্রক্রিয়াবলি হিসেবে যে দুটি ধারার অবতারণা করা হয়েছিল তারা প্রকৃতপক্ষে বিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতাই রাখে না বলে বুঝা গিয়েছে।

ডারউইন "প্রাকৃতিক নির্বাচন" প্রক্রিয়াকে তার উত্থাপিত বিবর্তনবাদের ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করান। তিনি এই পদ্ধতির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন তা তার বইটির নামকরণেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে ঃ "প্রজাতির উৎপত্তি, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ..."

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রসঙ্গে এ ধারণাই দেয়া হয়, যে সমস্ত জীব তাদের আবাসভূমির স্বাভাবিক অবস্থার অধিকতর শক্তিশালী ও যোগ্যতর তারাই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন এক হরিণের পাল যখন অন্য কোন হিংস্র জন্তুর কবলে পতিত হয়, তখন যেগুলো দ্রুতবেগে দৌড়ে পালিয়ে যাবে কেবল তারাই টিকে যাবে। সুতরাং টিকে যাওয়া হরিণের পালটিতে আরও অধিকতর দ্রুত ও শক্তিশালী হরিণ থাকবে। কিন্তু, প্রশ্নাতীত ভাবেই এই পদ্ধতি কোন হরিণকে বিকশিত করে অন্য প্রাণী যেমন ঘোড়ায় রূপান্তরিত করবে না।

অতএব প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রক্রিয়ার কোন বিবর্তন ঘটানোর ক্ষমতা নেই। ডারউইন ও এই সত্য অবগত ছিলেন এবং "প্রজাতি উৎপত্তি বই"তে এই বলতে হয়েছিল যে অনুকূল বৈচিত্র দৈবৎ সংগঠিত না হলে প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না।

অনতিক্রম্য প্রথম ধাপ ঃ প্রাণের উন্মিষ

বিবর্তন মতবাদ শুধুমাত্র তর্কের খাতিরে এটাই শুদ্ধ বলে ধরে নেয় যে, ৩.৮ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত একটিমাত্র কোষ হতেই সমস্ত জীবিত প্রজাতির বিকাশ ঘটেছে। কিভাবে এই একটিমাত্র কোষ থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন জটিল প্রজাতির উদ্ভব হল আর বিবর্তন বলে কিছু যদি ঘটেই থাকে তবে ফসিল রেকর্ডে কেনইবা এর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এ ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তর এই মতবাদে পাওয়া যায় না। যাহোক, সর্বাগ্রে, উক্ত বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের অনুসন্ধান করতে হবে। কিভাবে এই 'আদি কোষের' উৎপত্তি হল?

বিবর্তনবাদ যেহেতু সৃষ্টি কৌশলকে অস্বীকার করে এবং অতি প্রাকৃতিক কোন প্রকার মধ্যস্থতা মেনে নেয় না, এটা দৃঢ়তার সাথে বলে যে, 'আদি কোষ' কোন নক্শা, পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনা ছাড়াই প্রকৃতির প্রয়োজনেই হঠাৎ এক আকস্মিক যোগাযোগের

মাধ্যমে উৎপত্তি লাভ করেছে। এই মতবাদ অনুসারে একটা জীবন্ত কোষ জড় বস্তুর যুগপৎ ঘটনায় জন্ম নিয়েছে। যা হোক এটি জীব বিজ্ঞানের সবচেয়ে সর্বস্বীকৃত নিয়মাবলির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ একটি দাবি।

"প্রাণীর উৎপত্তি প্রাণী থেকে"

ডারউইন তার বইটিতে কখনও প্রাণের উৎপত্তির ব্যাপারটি উল্লেখ করেন নি। তার সময়কার বিজ্ঞান যে অনুমানের উপর নির্ভর করত তা হল—জীবসমূহের গঠন অতীব সরল। মধ্যযুগ থেকেই স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদনের (Sponlaneous enenation) নামে এই থিওরী দাবি করে আসছিল এই বলে যে, জড় পদার্থগুলো একত্রে মিলিত হয়েই জীববস্তুর উদ্ভব ঘটায়। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হত যে, ফেলে রাখা অতিরিক্ত খাবার থেকে পোকামাকড় আর গম থেকে ইঁদুর জন্ম নেয়। এই মতবাদ প্রমাণের জন্য মজার গবেষণা চালানো হত। একটি ময়লা কাপড়ের টুকরার ওপর কিছু গম রেখে দেয়া হত আর কিছুক্ষণ পরেই তা থেকে ইঁদুর জন্ম নেবে বলে বিশ্বাস করা হত।

একইভাবে মাংস থেকে কীটের উৎপত্তি স্বতঃস্ফূর্ত উৎপাদন একটা প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হত। যাহোক মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানেই এটা বুঝা গেল যে, কীটগুলো মাংস থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্ম নেয় না। বরং মাছি খালি চোখে দেখা যায় না এমন আকারের লারভা মাংসের উপর নিয়ে আসে যা পরে লার্ভার আকারে দৃশ্যমান হয়।

যে সময়ে ডারউইন তার "প্রজাতির উৎপত্তি" বইখানা লিখেন তখনও ব্যাকটেরিয়া জড়বস্তু থেকে জন্ম নেয় এমন একটা বিশ্বাস বিজ্ঞান জগতে সর্বত্র বহুল প্রচলিত ছিল।

কিন্তু ডারউইনের বই প্রকাশনার মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় লুই পাস্তুরের আবিষ্কার "বিবর্তনের ভিত্তি স্থাপনকারী" এই বিশ্বাসকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। দীর্ঘ সময় ধরে অধ্যয়ন ও গবেষণা শেষে পাস্তুর যে সিদ্ধান্তে আসেন তার সার সংক্ষেপ হল ঃ "জড় পদার্থ থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়—এই দাবী ইতিহাসের পাতায় চিরতরে সমাহিত হয়ে গেল।"

বিবর্তন মতবাদের সমর্থকগণ পাস্তুরের এই প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে দীর্ঘদিন যাবৎ ঠেকিয়ে রেখেছিল। যাহোক বিজ্ঞানে অগ্রযাত্রা যখন জীবকোষের অতি জটিল গঠনের জট খোলে দিল, তার সাথে সাথে প্রাণের যুগপৎ ঘটনায় অস্তিত্বে আসার কাল্পনিক ধারণা সম্পূর্ণ অচলাবস্থার মুখোমুখি হল।

বিংশ শতাব্দীর সিদ্ধান্তহীন প্রচেষ্টা

খ্যাতনামা রুশ জীববিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার ওপারিন (Alexander Oparin) হলেন প্রথম বিবর্তনবাদী যিনি বিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম "জীবনের উৎপত্তি" বিষয়টিতে আবার হাত দিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে বিভিন্ন যুক্তি তথ্য দিয়ে এগিয়ে আসলেন এটা প্রমাণ করতে যে, জীব কোষ যুগপৎ ঘটনায় উৎপন্ন হতে পারে। যাহোক, এবারও সমুদয়

অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল, আর ওপারিনকে নিচের স্বীকারোক্তি খানি করতে হল ঃ

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোষের উৎপত্তি বিষয়টি প্রশ্ন হিসেবেই রয়ে গেল যা-কিনা প্রকৃতপক্ষে পূর্ণাঙ্গ বিবর্তন মতবাদের সবচেয়ে কালো একটি পয়েন্ট।"

ওপারিনের বিবর্তনবাদী অনুসারীগণ প্রাণের উৎপত্তি বিষয়টির সমাধানকল্পে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৯৫৩ সালে আমেরিকার রসায়নবিদ ষ্ট্যানলী মিলার (Stanely Millen) সবচেয়ে সুপরিচিত এই পরীক্ষাগুলো চালান।

তিনি গবেষণার একটি সেট তৈরি করলেন। তার যুক্তি অনুসারে, পৃথিবীর আদি অবস্থায় কোন কোন গ্যাস বিদ্যমান ছিল। তিনি সেগুলোকে পরীক্ষার সেটে একত্রে মিশালেন ও মিশ্রণটিতে শক্তি সরবরাহ করলেন। আর তখন সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের জৈব অণু (এমাইনো এসিড) তৈরি করলেন, এ সব অণুগুলোই প্রোটিনের কাঠামোতে থাকে।

এই পরীক্ষাটি বিবর্তনের স্বপক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ও সকল ধারা হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানেই এই গবেষণাটি অগ্রহণযোগ্য বলে প্রকাশিত হল। পরীক্ষাটিতে যে অবস্থা বা পরিবেশ ব্যবহৃত হয়েছিল তা যে পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা হতে অনেক অনেক ভিন্ন সেটাও বুঝা গেল।

দীর্ঘ নিরবতার পর মিলার স্বীকার করে নিলেন, তিনি যে মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন তা বাস্তবে নেই।

বিংশ শতাব্দী জুড়ে প্রাণের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় বিবর্তনবাদীদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। সান্ডিয়াগো স্ক্রিপস ইনষ্টিটিউটের ভূ-রসায়নবিদ জেফরি বাদা (Jeffery Bada) ১৯৯৮ সালে আর্থ-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এক অনুচ্ছেদে এই সত্যটিতে মেনে নিয়ে বললেন ঃ

"আজ এই বিংশ শতাব্দী ছেড়ে যাওয়ার প্রাক্কালেও সেই বড় বড় অমিমাংসিত সমস্যাবলির মুখোমুখি আমরা হচ্ছি যেমন হয়েছিলাম এই শতকে প্রবেশের সময় ঃ কিভাবে ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণের সঞ্চার হল।

আর তাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই নেই। এতটুকু ডারউইন নিজেও অবহিত ছিলেন এবং তার "প্রজাতির উৎপত্তি" বইটিতে এটা এভাবে উল্লেখ করে গিয়েছেন?

"প্রাকৃতিক নির্বাচন কিছুই করতে পারে না যে পর্যন্ত না অনুকূল পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা না ঘটে।"

ল্যামার্কের প্রভাব

তবে কিভাবে এই "অনুকূল পরিবর্তনগুলো" ঘটবে? ডারউইন তার সময়কার বিজ্ঞানের পুরনো জ্ঞানভান্ডার থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। ডারউইনের আগে ফ্রান্সের জীববিজ্ঞানী ল্যামার্কের মতানুসারে,

"জীব তাদের অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে প্রেরণ করে যেগুলোই ক্রমে ক্রমে জমা হয়ে নতুন বৈশিষ্ট্যের নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটায়।

যেমন, ল্যামার্কের মতে, জিরাফ এক ধরনের কৃষ্ণকায় হরিণ থেকে বিকশিত হয়। কালো হরিণগুলো উঁচু বৃক্ষের পাতা খাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করতে গেলে তাদের ঘাড় একটু একটু করে প্রসারিত হত। এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে প্রসারিত হতে হতে তারা জিরাফে রূপান্তরিত হয়ে যায়।"

ডারউইন নিজেও একই ধরনের উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন, কিছু ভালুক মাছ ধরতে গিয়ে কালের পরিক্রমায় তিমিতে রূপান্তরিত হয়। এটা তিনি 'প্রজাতির উৎস' বইটিতে উল্লেখ করেন।

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ম্যান্ডেল তার উত্তরাধিকার সূত্রাবলি আবিষ্কার করেন এবং বংশানুগতি সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (প্রজনন শাস্ত্র) কর্তৃক এ সূত্রাবলির যথার্থতা যাচাই করেন। তখন এই সূত্রগুলো আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং এগুলোই "অর্জিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পরবর্তী প্রজন্মে প্রেরিত হয়"—এ ধরনের উপাখ্যানকে নাক করে দেয়।

এভাবেই "প্রাকৃতিক নির্বাচন" এক ব্যর্থ প্রক্রিয়া হিসেবে "সম্পূর্ণ একাকী" থেকে যায়।

নব্য ডারউইনবাদ এবং মিউটেশন

ডারউইন ভক্তরা ১৯৩০ সালের শেষ দিকে এই মতবাদের একটা সমাধান লাভের লক্ষ্যে 'আধুনিক সংশ্লেষণ থিওরী' অথবা যা আরও সাধারণভাবে নব্য ডারউইন বাদ নামে পরিচিত তা উপস্থাপন করেন। নব্য ডারউইনবাদে মিউটেশন যোগ হয়—যা বাহ্যিক প্রভাব যেমন বিকিরণ অথবা সংজনন ভ্রান্তির কারণে জীবে জিনে বিকৃতি যা অনুকূল পরিবৃত্তির কারণ।

আজ এই পৃথিবীতে বিবর্তনের যে মডেলটি আমরা দেখতে পাই তা এই "নব্য ডারউইনবাদ"। এই মতবাদ এটাই বলে যাচ্ছে যে, ভূ-পৃষ্ঠে মিলিয়ন মিলিয়ন যে জীব সৃষ্টি হয়েছে একটি পদ্ধতির ফলে যা দ্বারা তাদের জটিল অঙ্গসমূহ যেমন ঃ চোখ, কান, ফুসফুস, পাখা ইত্যাদি "মিউটেশনের" অর্থাৎ জিনগত বিশৃঙ্খলার প্রভাবে আসে।

তথাপি নির্জলা বৈজ্ঞানিক তথ্য হল যা কিনা এই থিওরীকে এই কারণে বর্জন করে যে, "মিউটেশন কখনও জীবদেহের বিকাশ বা উন্নয়ন ঘটায় না বরং উল্টো তাদের ক্ষতি করে।

এর কারণ খুবই সাধারণ ঃ ডিএনএ-গুলো রয়েছে অতি জটিল এক গঠন, এলোপাতাড়ি যে কোন প্রভাবই এ কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

আমেরিকার প্রজনন শাস্ত্রবিদ বি, জি, রাঙানাথান এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ

"মিউটেশন হল ক্ষুদ্র, এলোপাতাড়ি ও ক্ষতিকর প্রক্রিয়া। এগুলো কদাচিৎ ঘটে আর ঘটে গেলেও এটা ভাল লক্ষণ যে তারা কার্যকরী হয় না। মিউটেশনের ৪টি বৈশিষ্ট্য

এটাই সূচিত করে যে, মিউটেশন কখনও বিবর্তন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটায় না। অত্যন্ত জটিল জীবদেহে এলোপাতাড়ি পরিবর্তনগুলো হয় ব্যর্থ নচেৎ ক্ষতিকর বলে পরিলক্ষিত হয়। যেমন ঃ একটা ঘড়িতে এলোপাতাড়ি পরিবর্তন একে উন্নতর ঘড়িতে রূপান্তরিত করতে পারে না। খুব সম্ভবত এতে ঘড়ির ক্ষতি হবে অথবা, এ প্রক্রিয়া ব্যর্থ হবে। আরও যেমন, ভূমিকম্প কখনও নগরীর সমৃদ্ধি ঘটায় না বরং এর ধ্বংসই ডেকে আনে।"

এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, 'মিউটেশন জীনের গায়ে বর্তমান সংকেত লিপির কোন প্রকার উন্নয়ন ঘটায়' এমন কোন উদাহরণই লক্ষ্য করা যায়নি। বরং সব ধরনের মিউটেশনই ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। যে মিউটেশন গুলোকে বিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে জীবদেহের জীনের কতগুলো সংঘটন যা বরং দেহের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর সাথে সাথে জীবগুলোকে অচল ও পঙ্গু করে দেয়। (মানবদেহে মিউটেশনের ক্ষতিকর প্রভাবের সবচেয়ে বড় উদাহরণ—ক্যান্সার।) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া কখনও কোন ক্রমবিকাশ পদ্ধতি হতে পারে না। অন্যদিকে "প্রাকৃতিক নির্বাচনও" নিজে নিজে কিছুই করতে পারে না। যা কিনা ডারউইন নিজেও মেনে নিয়েছেন। এই ব্যাপারগুলো দেখিয়ে দিচ্ছে যে প্রকৃতিতে কোন বিবর্তন প্রক্রিয়া বিদ্যমান নেই। যেহেতু বিবর্তনের কোন পদ্ধতিরই অস্তিত্ব নেই সেহেতু কাল্পনিক কোন বিবর্তনও ঘটতে পারে না।

ফসিল রেকর্ড ঃ মধ্যবর্তী কোন আকৃতির অস্তিত্ব নেই

ফসিল রেকর্ড হল সবচেয়ে বড় সেই প্রমাণ যা কিনা বিবর্তন মতবাদ কর্তৃক প্রস্তাবিত দৃশ্যকল্প সংঘটনই হয় নি—এটার সাক্ষ্য বহন করে।

বিবর্তন মতবাদ অনুসারে, প্রতিটি জীব তার পূর্বসূরী থেকে জন্ম লাভ করে। পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি অন্য কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে—এভাবে বাকি প্রজাতিগুলোরও বিবর্তন ঘটেছে। মতবাদ অনুযায়ী এই পরিবর্তন মিলিয়ন মিলিয়ন বছর ধরে ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে। ব্যাপারটি যদি এরূপ হত অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির অস্তিত্ব থাকা উচিত ছিল এবং এরা এই দীর্ঘ পরিবর্তন পদ্ধতিতে বর্তমান থাকত।

উদারণস্বরূপ কিছু অর্ধমাছ/অর্ধ সরীসৃপ এর অস্তিত্ব থাকত যাতে পূর্বে থেকে যাওয়া মাছের বৈশিষ্ট্যের সাথে সরীসৃপের বৈশিষ্ট্য যোগ হত। অথবা কিছু সরীসৃপ পাখি জাতীয় প্রাণীর থাকত যেখানে আগে থেকে বিদ্যমান সরীসৃপের বৈশিষ্ট্যের সাথে পাখির বৈশিষ্ট্য যোগ হত। যেহেতু এগুলো একরূপ থেকে অন্যরূপে উত্তরণের মধ্য সময়ে জন্ম নিত তাই তাদের অক্ষম, ত্রুটিপূর্ণ, পঙ্গু জীব হিসেবেই বিদ্যমান থাকার কথা।

বিবর্তনবাদবাদীরা এ ধরনের কাল্পনিক প্রাণীর কথা বলে থাকেন যা অতীতে পরিবর্তনকালীন সময়ে দুয়ের মধ্যবর্তী আকারে বিদ্যমান ছিল বলে তাদের বিশ্বাস।

সত্যিই যদি এ ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব থাকত তারা সংখ্যা ও বৈচিত্র্যে হত মিলিয়ন থেকে বিলিয়ন অবধি। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, অদ্ভুত এই প্রাণীগুলোর দেহাবশেষ ফসিল রেকর্ড হিসেবে বিদ্যমান থাকত। প্রজাতির উৎপত্তি বইটিতে ডারউইন বলেছেন ঃ

"আমার থিওরীটি যদিই সত্যি হয়ে থাকে তবে একই গ্রুপের সমস্ত প্রজাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ স্থাপনকারী মধ্যবর্তী গঠনের এ সকল প্রাণীর সংখ্যা হবে নিশ্চিতভাবে অসংখ্য। ফলস্বরূপ, তাদের অতীতে বিদ্যমান থাকার চিহ্ন কেবল তাদের ফসিলসমূহেই থেকে যাবে।

ডারউইনের স্বপ্ন ভঙ্গ হল

যদিও উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে কোথাও কোন অন্তর্বর্তীকালীন গঠনের প্রাণী খুঁজে পাওয়া যায় নি, তথাপি বিবর্তনবাদীরা প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়েই ফসিলের (Fossil) খোঁজ করে যাচ্ছেন। মাটি খুঁড়ে তুলে আনা এসব ফসিলগুলো বিবর্তনবাদীদের প্রত্যাশার বিপরীত তথ্য প্রদর্শন করে এটাই প্রমাণ করছে যে, পৃথিবীতে "প্রাণ" এসেছে আকস্মিকভাবে আর পরিপূর্ণ আকার নিয়ে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ জীবাশ্মবিদ ডিরেক, ভি. একজন বিবর্তনবাদী কিন্তু তাও তিনি এ সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন এভাবে ঃ

"প্রকৃত সত্য হল এই যে, ফসিল রেকর্ডগুলো যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখি তা বর্গ বা প্রজাতি যে কোন স্তরেই থাকুক না কেন বারংবার আমরা যেন খুঁজে পাই। কোন ক্রমান্বয়ে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে নয় বরং এক গ্রুপের পরিবর্তে অন্য গ্রুপের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।"

ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, সমস্ত প্রজাতিই অন্তর্বর্তীকালীন কোন গঠন নিয়ে নয় বরং হঠাৎ করে পুর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। এটা ডারউইনের অনুমানের ঠিক বিপরীত। অধিকন্তু, এটাও একটা জ্বলন্ত প্রমাণ যে সমস্ত জীবকে "সৃষ্টি" করা হয়েছে। সমস্ত জীব যে পূর্ববর্তী কোন প্রজন্ম থেকে বিকশিত হয়ে নয় বরং আকস্মিক ও অখন্ডভাবে আবির্ভূত হয়েছে তার ব্যাখ্যা এটাই হবে যে এগুলোকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুপরিচিত বিবর্তনবাদী জীববিদ ডগলাস ফুতুমা (Douglas Futuyma) এই সত্য মেনে নিয়ে বলেছেন ঃ

"সৃষ্টি ও বিবর্তন ও দুয়ের মাঝামাঝি প্রজাতির উৎপত্তির ব্যাখ্যা ফুরিয়ে যায়। প্রাণীসমূহ পৃথিবীতে এসেছে হয় পূর্ণাঙ্গরূপে অথবা নয়। যদি পূর্ণাঙ্গভাবে না এসে থাকে তবে তাদের পূর্বে বিদ্যমান কোন প্রজাতি হতে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে। আর যদি তারা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে এসে থাকে তবে অবশ্যই এরা সর্বশক্তিমানের এক কৌশলী সৃষ্টিকর্ম।"

ফসিলগুলো থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ভূ-পৃষ্ঠে প্রাণসত্ত্বার আবির্ভাব ঘটেছে নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ রূপে। এর মানে প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে সৃষ্টি কৌশলের মধ্য দিয়ে, বিবর্তনের মাধ্যমে নয়। এটা ডারউইনের অনুমানের ঠিক বিপরীত।

মানব বিবর্তনের কাহিনী

"মানব জাতির উৎস" এটাই বিবর্তন মতবাদের ভক্তদের সর্বাধিক উত্থাপিত বিষয়। ডারউইনের সমর্থকরা এই বলে দাবি করে থাকেন যে, এখনকার এই আধুনিক মানবজাতি গরিলা বা শিম্পাঞ্জী জাতীয় প্রাণী থেকে বিকশিত হয়ে এসেছে। তাদের দাবী যে কথিত এই বিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয় ৪-৫ মিলিয়ন বছর আগে, আর তখন এখনকার মানবজাতি ও তার পূর্বপুরুষদের মাঝামাঝি গঠনের অন্তর্বর্তীকালীন কোনরূপ বর্তমান ছিল। সম্পূর্ণ কাল্পনিক এই রূপরেখা থেকে চারটি মূল শ্রেণীর তালিকা প্রকাশ করা যায় ঃ

১। অষ্ট্রেলো পিথেকাস (Australopithecus)

২। হোমো হেবিলিস (Homo habilis)

৩। হোমো ইরেকটাস (Homo encetus)

৪। হোমো সেপিয়েনস (Homo sapiens)

বিবর্তনবাদীরা মানবজাতির তথাকথিত পূর্বপুরুষের নাম রেখেছেন 'অষ্ট্রেলো পিথেকাস' অর্থাৎ 'দক্ষিণ আফ্রিকান বানর'। এই জীবগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বানর বৈ কিছু নয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার জই বিশ্বখ্যাত এনাটমিষ্ট লর্ড সলীযুকারম্যান এবং প্রফেসর চার্লিস অক্সনার্ড বিভিন্ন অষ্ট্রেলোপিথেকাস এর নমুনার উপর ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে এগুলো সাধারণ এক প্রকার গরিলা শ্রেণীর, তারা অধুনালুপ্ত আর মানবজাতির সাথে এদের কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি।

বিবর্তনবাদীরা মানব বিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়কে "হোমো" বা "মানুষ" নামে শ্রেণীকরণ করছেন। তাদের মতে হোমো শ্রেণীর জীবগুলো অষ্ট্রেলো পিথেকাস এর চেয়ে উন্নত ধরনের। বিবর্তনবাদীরা এই প্রাণীগুলোর বিভিন্ন প্রকার জীবাশ্ম নিয়ে এদের নির্দিষ্ট বিন্যাসে সাজিয়ে এক অলীক বিবর্তন বিন্যাস বা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন। এই বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এমন কোন প্রমাণই দাড় করানো যায় নি। তাই এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। বিংশ শতাব্দীতে বিবর্তন মতবাদের একজন অগ্রবর্তী সমর্থক **আর্নষ্ট মায়ার** মেনে নিয়েছেন যে, "হোমো সেপিয়েন পর্যন্ত যে চেইন বা যোগসূত্র থাকার কথা ছিল তা নেই, হারিয়ে গেছে।"

যোগসূত্র স্থাপনকারী এই চেইনের রূপরেখা টানা হয়েছে এভাবে—

অষ্ট্রেলো পিথেকাস → হোমো হেবিলিস → হোমো ইরেকটাস → হোমা সেপিয়েনস। বিবর্তনবাদীরা এভাবে এটাই দেখাতে চান যে, এদের প্রত্যেকে একে অপরের আদি পুরুষ। তবে, জীবাশ্মবিদদের সাম্প্রতিক গবেষণায় এটা প্রকাশিত হয়েছে যে, অষ্ট্রেলো পিথেকাস, হোমো হেবিলিস ও হোমো ইরেকটাস একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান ছিল।

তদুপরি Homoerectus নামে শ্রেণীভুক্ত মানুষের নির্দিষ্ট অংশ।

বেশ সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বসবাস করে আসছিল। হোমো সেপিয়েমস নিয়ানডার থেলেনসিস্ ও হোমোসেপিয়েন্স আধুনিক মনুষ্যত্ব একই অঞ্চলে পাশাপাশি অবস্থান করত।

এই অবস্থা সুস্পষ্টভাবে, তাদের একজন আরেকজনের পূর্বসুরী এ দাবিকে দুর্বল করে দেয়। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির জীবাশ্মবিদ যিনি নিজেও বিবর্তনবাদ সমর্থক ষ্টীফেন জেই গোলড থিওরীর এই অচলাবস্থার বর্ণনা করেছেন—

"আমাদের এগিয়ে যাওয়ার ধাপ কি হতে পারে যদি তিন ধরনের হোমিনিড বংশানুক্রম (A. Afnicans বিশাল অষ্ট্রেলোপি থেসিমস এবং H. habilis) একই সাথে বর্তমান থাকে যেখানে কেউই একজন আরেকজন হতে বিবর্তিত হয়নি? অধিকন্তু পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে এদের কেউ বিবর্তনের কোন প্রবণতাই দেখায় না।

সংক্ষিপ্তভাবে, মানব বিবর্তনের এই গল্প চালু রাখতে অর্ধেক বানর অর্ধেক মানুষ এ ধরনের ড্রইং এর সাহায্য নেয়া হয় যেগুলো কি-না প্রচার মাধ্যমে ও কোস পুস্তকে তুলে ধরতে চাওয়া হয়। এটা নিছকই প্রচারণা দ্বারা কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য ছাড়াই আজগুবী গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী লর্ড সলী যুকারম্যান এই বিষয়টির উপর বছরের পর বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন। বিশেষ করে অষ্ট্রেলো পিথেকাস এর উপর ১৫ বছর কাজ করে নিজে বিবর্তনবাদী হয়েও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে,

"সত্যি বলতে কি বানর সদৃশ প্রাণী থেকে মানুষ পর্যন্ত পৌছে এমন কোন বংশ তালিকার অস্তিত্ব নেই।"

যুকারম্যান আবার এক আকর্ষণীয় পরিসর বিজ্ঞানের তৈরি করেছেন। তার মতে যা সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক তা থেকে শুরু করে যা সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক সে পর্যন্ত বিস্তৃত এই পরিসর গঠন করেন তিনি। তার এই পরিসরের প্রথম সারিতে সাথে রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান যা কিনা বিজ্ঞানের বাস্তব সুনির্দিষ্ট ডাটাফিল্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এরপর আসে জীব সম্পর্কিত বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান। এই পরিসরের অনেক পরের দিকে আসে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি (Extnasensony perception)-সমূহ যেমন Telepathy ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। এগুলো সবচেয়ে অবৈজ্ঞানিক বলে ধারণা করা হয়। পরিশেষে মানব বিবর্তন। যুকারম্যান তার যুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে ঃ

"আমরা যখন অনুমান নির্ভর জীববিজ্ঞান যেমন, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধি কিংবা ফসিলের ইতিহাসের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করি যেখানে বিবর্তনবাদে বিশ্বাসীদের মতে সবকিছুই সম্ভব বলে বিবেচিত হয় আর বিবর্তনের অতিভক্তরা একই সময়ে বিবর্তনের পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন জিনিসও বিশ্বাস করতে শুরু করে—

"প্রকৃতপক্ষে তখন আমরা বাস্তব সত্য হতে অনেক দূরে সরে যাই।"

মানজ জাতির বিবর্তনের গল্প গুটিকয়েক অন্ধ বিবর্তনবাদ ভক্ত ব্যক্তি কর্তৃক মাটি খুঁড়ে তুলে আনা ফসিলের পক্ষপাত দুষ্ট ব্যাখ্যাই দিয়েছে কিন্তু কোন সফলতা পায়নি।

বস্তুবাদী বিশ্বাস ঃ

এতদূর পর্যন্ত আমরা যে তথ্যাবলি উপস্থাপন করেছি, তা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিবর্তন মতবাদ এমন একটি দাবি যার সাথে বৈজ্ঞানিকদের পাওয়া তথ্যের কোন সাদৃশ্য নেই, প্রাণের উৎপত্তির বেলায় এই মতবাদের যুক্তি বিজ্ঞানের সাথে অসঙ্গতি পূর্ণ। এর প্রস্তাবিত বিবর্তন পদ্ধতিগুলোর বিবর্তন ঘটানোর কোন ক্ষমতাই নেই, আর ফসিল রেকর্ডগুলো স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, থিওরীর জন্য দরকারি অন্তর্বর্তীকালীন কোন আকার বা গঠনের প্রাণী কখনও বিদ্যমান ছিল না।

সুতরাং এটাই বাস্তব যে, বিবর্তন মতবাদকে অবৈজ্ঞানিক বলে পরিত্যাগ করা উচিত যেমনভাবে, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে বিশ্বের মডেল তৈরি এমন কিছু ধারণা ইতিহাসে বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দিয়ে দেয়া হয়েছে।

কিন্তু তবুও বিজ্ঞানের আলোচ্য সূচীতে বিবর্তন মতবাদকে সাগ্রহেই বহাল রাখা হচ্ছে। এমনকি কিছু কিছু লোক এই থিওরীর সমালোচনাগুলোকে বিজ্ঞানের উপর আক্রমণ হিসেবে উপস্থাপনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু কেন?

কারণ হল বিবর্তন মতবাদ একই সূত্রে গাঁথা (একই মতাবলম্বী) কিছু লোকের অন্ধবিশ্বাস। এরা অন্ধভাবে বস্তুবাদ দর্শনের অনুরক্ত। আর তারা ডারউইনবাদকে এজন্য সমর্থন করে কেননা এটাই একমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা যা প্রকৃতিতে সহজে উপস্থাপন করা যায়।

যথেষ্ট কৌতুহলের ব্যাপার হল যে, তারা আবার এই সত্যকে সময়ে সময়ে স্বীকার করে থাকে।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রখ্যাত জীববিদ খোলাখুলি বিবর্তনবাদী হিসেবে পরিচিত রিচার্ড. সি. নিউওনটিন স্বীকার করেছেন যে তিনি সর্বাগ্রে একজন বস্তুবাদী এবং তারপর একজন বিজ্ঞানী।

তিনি বলেন ঃ

"এটা এমন নয় যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীতে বস্তুবাদ ব্যাখ্যা গ্রহণে ঠেলে দিয়েছে।

বরং আমরা আমাদের নিজেদের পার্থিব জিনিসের প্রতি প্রধান মোহ থাকার কারণে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার সরঞ্জাম ও কিছু ধারণার সেট তৈরি করতে বাধ্য হয়েছি যা-কি-না বস্তুগত ব্যাখ্যা প্রদান করে তাতে হোক না তা অন্তর্জ্ঞানের যতই পরিপন্থী, যতই না ধাঁ ধাঁ লাগানো হোক (এই মতবাদে) অদিক্ষীতদের জন্য তাতে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। অধিকন্তু বস্তুবাদই আসল ও সবকিছু। তাই আমরা আমাদের দোর গোড়ায় স্বর্গীয় পদচারণা মেনে নিতে পারি না।"

এই সুস্পষ্ট বক্তব্যগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, বস্তুবাদ দর্শনে আসক্ত থাকার জন্যই ডারউইনবাদ নামে এক ধরনের অন্ধবিশ্বাসকে জিইয়ে রাখা হয়েছে। এই বিশ্বাস এটা

বলতে চায় যে, "বস্তু ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই।" তাই এই মতবাদে ভিন্নমত পোষণ করে বলা হয় যে, "জড় ও অচেতন বস্তু থেকেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটেছে।"

পাখি, মাছ, জিরাফ, বাঘ, পোকামাকড়, বৃক্ষ, ফুল, তিমি ও মানবজাতি—এ ধরনের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাতিসমূহ বৃষ্টিধারা বজ্রপাত ইত্যাদি বিভিন্ন জড়পদার্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে জন্মলাভ করেছে। এটাই এই মতবাদের ধারণা, যা যুক্তি ও বিজ্ঞানের উভয়ের পরিপন্থী এক অনুশাসন। তথাপি ডারউইনবাদীরা কেবল "স্বর্গীয় পদ দোরগোড়ায় মেনে নেবে না।" বলে এ অনুশাসন সমর্থন করে যাচ্ছে।

প্রত্যেক ব্যক্তি যে একটি বস্তুবাদী সংস্কার দ্বারা জীবের উৎপত্তির প্রতি দৃকপাত করে না তারা এই স্পষ্ট সত্য দেখতে পাবে ঃ সকল জীব একজন স্রষ্টার সৃষ্টি কর্ম। যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বজানা, এই স্রষ্টাই হল আল্লাহ যিনি অনস্থিত্ব থেকে বিশ্ব চরাচর সৃষ্টি করেছেন, অত্যন্ত নিখুঁত আকারে ডিজাইন করেছেন এবং সকল জীবকে আকার দিয়েছেন।

হারুন ইয়াহিয়ার আরও কিছু গ্রন্থাবলি

পরমাণুর অভ্যন্তরে বিস্ময় ঃ একটি দেহ যা পরমাণু দ্বারা গঠিত, তা বাতাস থেকে শ্বাস নেয়, খাদ্য খায়, তরল পানীয় পান করে, তা সবকিছু পরমাণু দ্বারা গঠিত। প্রতিটি বস্তু যা দেখ তা ফোটনসহ এটমের ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ছাড়া কিছুই নয়।

এই বইয়ে, পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত গঠন, প্রত্যেক বস্তুর গঠন খণ্ড জীব বা জড় বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহর নিখুঁত সৃজন প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।

প্রকৃতিতে ডিজাইন ঃ একটি পাখির পালকের পূর্ণাঙ্গ বাদুরের গলার তন্ত্র (শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে গঠিত) অথবা একটি মাছির ডানার গঠনাকৃতি ডিজাইন প্রকাশ করে। এই ডিজাইনসমূহ স্বীকৃতি দেয় যে আল্লাহ এগুলো নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করেছেন।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ ঃ অনেক সমাজ যারা আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে ...। তাদের সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে কিছু আগ্নেয়গিরীর অগ্ন্যুৎপাতের দ্বারা কিছু সর্বনাশা বন্যা দ্বারা এবং কিছু ঝড় তুফান দ্বারা।

ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহ কোরআনে বর্নিত এই শাস্তি প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের আলোকে অনুসন্ধান করে।

বর্ণ বিষয়ে আল্লাহর শিল্পরুচী ঃ রঙ, প্যাটার্ন, ছাপ এমনকি প্রকৃতিতে বিদ্যমান প্রতিটি জীবের রেখাসমূহের একটি অর্থ আছে। কিছু প্রজাতির জন্য যাতায়াতের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে, অন্যদের জন্য সেগুলো শত্রুদের বিরুদ্ধে সাবধান বাণী ঘটনা যাই হোক, রঙ জীবের মঙ্গলের জন্য অতি প্রয়োজনীয়। একটি মনোযোগী চোখ তাৎক্ষণিকভাবে স্বীকার করে যে কেবলমাত্র জীব নয় বরং প্রকৃতির সবকিছু যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমন আছে। তদুপরি তিনি উপলব্ধি করবেন যে সব কিছু মানুষের সেবার জন্য প্রদান করা হয়েছে ঃ আকাশের আরামদায়ক নীল রঙ, ফুলের বর্ণাঢ্য রূপ, উজ্জল সবুজ বৃক্ষাদি ও তৃণভূমি চন্দ্র এবং তারকারাজি যারা ঘন কালো অন্ধকার আলোকিত করে মানুষের চারদিকে অসংখ্য সৌন্দর্য্যসহ।

সমাধান ঃ কোরআনের নীতিকথাসমূহ ঃ যে সকল মানুষ নির্যাতিত, নিপীড়ণ করতে করতে মেরে ফেলা হয়, মাসুম শিশু, যারা একটু এমনকি একখণ্ড রুটিও যোগাতে পারেনা, যারা তাবুতে অথবা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রাস্তায় ঘুমাতে বাধ্য হয়, কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোন গোষ্ঠীর লোক বলে যাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ধর্মের কারণে বৃদ্ধ

বৃদ্ধাদেরকে ঘরবাড়ি থেকে বহিষ্কার করা হয়, পরিণামে এসব অবিচার, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, নৃশংস হত্যালীলা, ক্ষুধা, দারিদ্র এবং অত্যাচার এর কেবলমাত্র একটি সমাধান ঃ কোরআনের নীতিকথা।

জিশু আসবেন ঃ কোরআনে জিশু-এর দ্বিতীয়বার আগমন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ আছে যা একটি হাদিসে পূর্বোল্লিখিত হয়েছে জিশু সম্পর্কে কোরআনে নাযিলকৃত তথ্যের উপলব্ধি কেবলমাত্র জিশুর মাধ্যমে সম্ভব।

কখনও অজ্ঞতা পেশ করেনা ঃ আল্লাহর সুস্পষ্ট প্রমাণ যে প্রত্যেক বস্তু আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু যার তুমি উপজীবিকার জন্য মালিক হচ্ছ তা আল্লাহ প্রদত্ত, মৃত্যুর বাস্তবতা, কোরআন আল্লাহর কিতাব, তুমি তোমার কাজের হিসাব দেবে, তোমার বিবেকের কণ্ঠস্বর যা তোমাকে সত্য কাজের দিকে আহ্বান করে, পরকালের অস্তিত্ব এবং হাশরের দিন, দোযখ কঠিন আজাবের চির আবাস এবং ভাগ্যো বাস্তবতা।

সত্য জীবন পৃথিবী ঃ মানুষ কেন জীবনের প্রতি সম্পৃক্ত এত অনুভাব করে এবং ধর্মকে পার্শ্বে সরিয়ে দেয় তার বড় কারণের মধ্যে এই হল জীবন যে চিরন্তন একটি অনুমান। মৃত্যু যে কোন সময় এই জীবনের সমাপ্তি ঘটাবে এই কথা ভুলে, মানুষ সোজা বিশ্বাস করে যে সে সম্পূর্ণ ও সুখী জীবন উপভোগ করতে পারে। তথাপি সে স্পষ্টতঃ নিজের প্রতারিত করে। মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট পৃথিবী একটি অস্থায়ী স্থান। সে জন্য এটা অঅন্তর্নিহিতভাবে যুক্ত, মানুষের অন্তহীন চাহিদা ও বাসনা মেটানো আদৌ সক্ষম নয়। পৃথিবীতে বিদ্যমান প্রতিটি ও প্রত্যেকটি আকর্ষণ পরিণামে নিঃশোষিত হয়, কলুষিত হয় ক্ষয় হয় ও সর্বশেষ অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি জীবনের অপরিবর্তনীয় নয় বাস্তবতা।

এই বইটি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্যাস সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে এবং মানুষকে চিন্তা করতে পরিচালনা করে সেই বাস্তব স্থান যার সে অধিবাসী হবে– নাম তার পরকাল।

বিবর্তন প্রবঞ্চনা ঃ অনেকেই মনে করেন ডারউইনের বিবর্তন মতবাদ একটি প্রমাণিত সত্য বিষয়। প্রচলিত এই জ্ঞান এর বিপরীত কথা হল বিজ্ঞানের আধুনিক তথ্য এই মতবাদকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছে। পৃথিবীব্যাপী প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে ডারউইনবাদ এখন যে মানুষের মনে প্রচার অভিযান মাধ্যমে গছিয়ে দেওয়া হয়েছে তার একমাত্র কারণ মতবাদটির ভাবগত দিকটির মধ্যে নিহিত।

এই বই বিবর্তন মতবাদের ধ্বস বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে এমনভাবে যা বিস্তারিত এবং বুঝাতে সহজ। বিবর্তনকে 'প্রমাণ' করাতে বিবর্তনবাদীদের যে জালিয়াত ও বিকৃতি সাধন করেছেন তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। যারা বুঝে এর জন্য।

বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য ঃ কোরআন কেন নাজিল হল, তার উদ্দেশ্যসমূহের একটি হল মানুষকে সৃষ্টি এবং এর কর্মকুশল সম্পর্কে চিন্তা করতে আহ্বান জানানো। যখন একজন মানুষ তার নিজের দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অথবা

প্রকৃতির যেকোন জীব, পৃথিবী অথবা সমগ্র বিশ্বচরাচর, তাতে তিনি একটি মহান ডিজাইন, পরিকল্পনা এবং বুদ্ধিমত্তা দেখতে পান। এসব সাক্ষ্যপ্রমাণ আল্লাহর অস্তিত্ব তাতে প্রত্যক্ষ করেন।

বোধশক্তি সম্পন্ন মানুষের লিখা হয়েছিল পাঠককে প্রকৃতি সৃষ্টির কিছু দেখতে ও উপলব্ধি করতে। বহু জীবন্ত বিস্ময়কর ঘটনা এই বই শত শত ছবি এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এই বইয়ে প্রপণ করা হয়েছে।

আল্লাহর সৃষ্টির আশ্চর্য ঘটনাবলি ঃ সর্বপ্রথম মানব কে ছিলেন? তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছিল, অথচ প্রথম মানুষটির পিতামাতা থাকতে পারেনা। সুতরাং কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করল। এই বইয়ে

তুমি এই প্রশ্ন সমূহের উত্তর পাবে, আমাদের এই পৃথিবী কেমনে অস্তিত্ব লাভ করল, কেমনে চাঁদ ও সূর্য্য জন্ম নিল? জন্মের আগে আপনি কোথায় ছিলেন? কেমনে সমুদ্র, বৃক্ষ, প্রাণী পৃথিবীতে আবির্ভূত হল? কিভাবে আপনার প্রিয় কলা, চেরি, কুল তাদের উজ্জল রঙ মনোমুগ্ধকর গন্ধসহ কালো মাটিতে জন্ম নেয়। কেমনে একটি ক্ষুদ্র মৌমাছি জানে কিভাবে সুস্বাদু মধু তৈরি করতে হয়? কিভাবে ইহা একটি সুক্ষ্ম প্রাণসীমা কিনারা সম্বলিত মৌচাক নির্মাণ করে?

আপনি যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোন জানা নেই আপনি সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী।
(সূরা আল-বাকারা ঃ ৩২)

মাতৃগর্ভে আসার এবং তারপর পৃথিবীতে জন্ম নেয়ার পূর্বে আপনি যে একদিন ছিলেন না, এই সত্য সম্বন্ধে কখনও ভেবে দেখেছেন এবং (ভেবেছেন কি) যে, আপনি মাত্র 'কিছুই-না' থেকে আপন অস্তিত্বে আবির্ভূত হয়েছেন?

আপনি কি কখনও এই সম্বন্ধে ভেবেছেন যে, প্রতিদিন আপনার দিনের বেলায় কাজ করার কক্ষটিতে কেমনে ফুলসমূহ আলকাতরা-কালো, কর্দমাক্ত মাটি থেকে সুবাসিত ঘ্রাণ নিয়ে আবির্ভূত হয় এবং এগুলো দেখতে খুবই মনোহর।

কখনও ভেবে দেখেছেন কি করে মশককূল যা বিরক্তিকরভাবে আপনার চারপাশে ঘুরে বেড়ায়, তাদের ডানাগুলো এত দ্রুত নাড়ায় যে, আমরা তাদের দেখতে পাই না?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন কিভাবে ফলের খোসা যেমন কলা, তরমুজ, ফুটি এবং কমলার উন্নতমানের আবরণী হিসেবে কাজ করে এবং কিভাবে ফল এ আবরণীর ভেতর আবদ্ধ থাকে যাতে সেগুলোর স্বাদ, গন্ধ সংরক্ষিত হয়?

আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন এমন সম্ভাবনার কথা যখন আপনি নিদ্রামগ্ন, সহসা ভূমিকম্পে আপনার বাড়ি, আপনার অফিস এবং আপনার (গোটা) শহরটি মাটিতে ধূলিস্যাত হয়ে গেল এবং মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনি দুনিয়ার যা কিছুর মালিক তা হারাতে পারেন?

আপনি কখনও ভেবেছেন কি, কেমনে আপনার জীবন দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে এবং আপনি বার্ধক্যে উপনীত হবেন ও দুর্বল হয়ে পড়বেন এবং ধীরে ধীরে আপনার সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাবেন?

আপনি কি কখনও ভেবেছেন যে, একদিন আল্লাহ কর্তৃক নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা আপনার সম্মুখে হাজির হবেন এবং তখন আপনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন?

ভাল কথা, আপনি কি কখনও সেই লোকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছেন, যারা দুনিয়ার প্রতি কেন এত বেশি জড়িত, যা থেকে তারা শীঘ্রই অন্তর্ধান করবে (এবং) যখন মূলতঃ পরকালের জন্য যা প্রয়োজন তার জন্য প্রাণপন চেষ্টা চালাবে?

লেখক পরিচিতি

গ্রন্থকার, যিনি হারুন ইয়াহিয়া ছদ্ম নামে লেখালেখি করেন, তিনি ১৯৫৬ সনে আঙ্কারায় জন্ম গ্রহণ করেন। আঙ্কারায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি ইস্তাম্বুল মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস ও ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯৮০ সন থেকে এই লেখক রাজনৈতিক, ধর্ম সম্পর্কিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বহু বই লিখেন। হারুন ইয়াহিয়া একজন লেখক হিসেবে সুপরিচিত, যিনি বিবর্তনবাদবাদীদের ভণ্ডামী, তাদের দাবীর অসারতা এবং ডারউইনবাদ ও অর্থহীন ভাববাদ যেমন ফ্যাসীবাদ ও কমিউনিজমের মধ্যে অন্ধ যোগাযোগ ফাঁস করে দিয়েছেন।

তার কিছু বই ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইটালি, স্পেনিশ, পর্তুগীজ, উর্দ্দু, আরবি, আলবেনিয়ান, রাশিয়ান, সার্ব-ক্রোট (বসনিয়ান), পোলিশ, মালয় বউগোর, টার্কিশ এবং ইন্দোনেশিয়া ভাষায় পাওয়া যায় এবং এগুলোর পাঠক সারা পৃথিবীব্যাপী।